ইমাম বুখারীর
দৃষ্টিতে
লা-মাযহাবী
মাওলানা আনোয়ার খুরশিদ দা. বা.

ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে লা-মাযহাবী

মূল

হযরত মাওলানা আনোয়ার খোরশেদ সাহেব দা. বা.

বিশিষ্ট শাগরেদ, উকিলে আহনাফ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমীন সফদর উকারভী রহ.

অনুবাদ

মাওলানা হারুনুর রশিদ

উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া

দারুল উলূম মাদানিয়া

দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

সম্পাদনা

মুফতী হাবীবুল্লাহ মিসবাহ্

ইফতা, জামিয়া দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

মুহাদ্দিস ও মুফতী, মাদরাসা বাইতুল উলূম, ঢালকানগর, ঢাকা-১২০৪

খতীব : মসজিদুন নূর, ১০নং লারমিনি স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩

মাকতাবাতুল হেরা

৮২/১২এ, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১০০০

০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯২৬-৮০৭৪৮০

ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে লা-মাযহাবী

মূল : হযরত মাওলানা আনোয়ার খোরশেদ সাহেব দা. বা.

অনুবাদ : মাওলানা হারুনুর রশিদ

প্রকাশক : মাকতাবাতুল হেরা,
৮২/১২এ, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল : শাবান ১৪৩৪ হিজরী

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

কম্পোজ : আলহেরা বর্ণসাজ

মূল্য : ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা

ইনতেসাব

তরজুমানে আহনাফ হযরত মাওলানা আমীন সাফদার উকারভী রহ.
(১৪২১ হি.) এর রূহের মাগফেরাত কামনায়।

যার সোহবতের বরকতে এই কিতাবটি বান্দার
আহলে ইলমের খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য হয়েছে।

گر قبول افتد زہے عز و شرف

-আনোয়ার খোরশেদ

পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীর সাবেক মুহাদ্দিস
হযরত মাওলানা ইসহাক রহ. এর দারাজাত বুলন্দী কামনায়–
যাঁর নিকট আমি অনেক অনেক বেশি ঋণী

–অনুবাদক

পূর্বকথা

লা-মাযহাবীগণ নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' নামে অভিহিত করে থাকে। তাদের মতে যার মর্ম দাঁড়ায় এই হাদীসের জ্ঞান তাদেরই রয়েছে এবং হাদীস অনুযায়ী আমলও কেবল তারাই করে থাকেন। রইল মাজহাবপন্থীরা। তাদের নিকট না হাদীস রয়েছে আর না তারা হাদীস অনুযায়ী আমল করে। লা-মাজহাবীদের এই ধারণা স্বকল্পিত এবং আত্মপ্রবঞ্চনা নির্ভর। বাস্তবতা হলো, এই ব্যক্তিদের হাদীস শাস্ত্রের সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই। কেবল বিরোধপূর্ণ কয়েকটি মাসআলাকে জ্ঞানচর্চার সর্বস্ব ধরে নিয়ে নিজেদেরকে মুহাদ্দিস এবং হাদীস মোতাবেক আমলকারী মনে করে। একারণেই তাদেরকে নামায বিষয়ক মাসলা-মাসায়েল বিশেষত নিত্য নতুন সৃষ্ট সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তারা বগল ঝাঁকাতে থাকেন এবং ঐসব লোকের কিতাবাদি ঘাটতে থাকেন যাদেরকে মুশরিক আখ্যা দিতে ক্লান্ত হন না।

যদি তাদের হাদীসবিদ্যার পরীক্ষা নিতে হয় তাহলে তাদেরকে কতিপয় মাসআলা জিজ্ঞেস করে দেখুন। তা আপনার খুব ভালভাবে জানা হয়ে যাবে। যেমন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন–

১. নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত নাকি নফল? যদি কেউ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামায শুরু করে তাহলে তার নামায হবে কি না?

২. তাকবীরে তাহরীমার সময় 'রফে ইয়াদাইন' ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত নাকি নফল? কেউ যদি রফে ইয়াদাইন ব্যতীত নামায শুরু করে তাহলে তার নামায হয়ে যাবে কি না?

৩. নামাযে হাত বাঁধা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত নাকি নফল? কেউ হাত না বাঁধলে তার নামায হবে কি না?

৪. নামাযের শুরুতে ছানা পড়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত নাকি নফল? কেউ ছানা না পড়লে তার নামায হবে কি না?

৫. রুকুতে যাওয়া এবং মাথা ওঠানোর সময় 'রফে ইয়াদাইন' ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত নাকি নফল? এ সময় কেউ তা না করলে তার নামায হবে কি না?

৬. কেউ রুকুতে سبحان ربي العظيم এর স্থলে سبحان ربي الاعلى এবং সিজদায় سبحان ربي الاعلى এর স্থলে سبحان ربي العظيم পড়লে তার নামায হবে কি না?

৭. এমনিভাবে আরো জিজ্ঞেস করুন– কেউ উড়োজাহাজে নামায আদায় করলে তার নামায হবে কি না?

৮. যে ক্যাসেটে কুরআন রেকর্ড করা হয়েছে তা ওজু ব্যতীত ধরা যাবে কি না?

৯. রেকর্ডকৃত সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না?

১০. রোজাবস্থায় ইঞ্জেকশন দিলে রোজা ভঙ্গ হবে কি না?

১১. টেলিফোন কিংবা ইন্টারনেটে বিয়ে করলে তা সংঘটিত হবে কি না? ইত্যাদি।

এসব মাসআলার উত্তর তারা কুরআন শরীফের কোন আয়াত অথবা সহীহ, সরীহ ও মারফু' হাদীস দ্বারা দিক। কোন ইমামের উক্তি কিংবা নিজেরা কোন ইজতিহাদ করে দিলে চলবে না। কেননা তাদের কথা মতে কোন ইমামের দলিলবিহীন কথা মানার নাম তাকলীদ। যা শিরক। এছাড়া ইজতিহাদ ও কিয়াস করা শয়তানী ক্রিয়াকাণ্ড। যা কিনা পথভ্রষ্টতার নামান্তর।

সম্মানিত পাঠক, লা-মাজহাবীদের দাবী হলো তারা 'আহলে হাদীস'। এর অর্থ হাদীসওয়ালা। আর মুকাল্লিদ তথা ইমামের অনুসরণকারীদের তারা আহলে 'ফিকহ' ও 'রায়' বলে থাকে। যার অর্থ ফিকহ ও রায়ওয়ালা। এমতাবস্থায় মূলগতভাবে প্রত্যেক মাসআলার হাদীস লা-মাজহাবীদেরই দেখানো উচিত। কেননা নিজ ধারণামতে তারা 'হাদীসওয়ালা'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা তো একদিকে আমাদেরকে আহলে ফিকহ বলে, অপরদিকে প্রত্যেক মাসআলায় হাদীসও তারা আমাদেরকেই দেখাতে বলে। অথচ শুরু থেকে আমরা দাবীই করি না যে, প্রত্যেক মাসআলার দলীল হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে।

জনসাধারণের বিষয়টি বোঝা উচিত এবং যখনই প্রসঙ্গটি উঠবে হাদীস লা-মাজহাবীদের কাছেই চাইতে হবে। কারণ তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস অর্থাৎ হাদীসওয়ালা বলে থাকে। বলা বাহুল্য যার নিকট যে জিনিস থাকে তার কাছেই তা চাওয়া হয়। লা-মাজহাবীদের বক্তব্য অনুযায়ী তারাই যখন হাদীসওয়ালা আর হাদীস রয়েছেও তাদের নিকট তখন তাদেরই হাদীস দেখানো কর্তব্য। অধিকন্তু তাদের বক্তব্যমতে আমাদের নিকট হাদীস যেহেতু নেই-ই ফিকহ আছে, তাদের আমাদেরকে হাদীস দেখাতে বলা ঠিক নয়।

চিন্তা করার বিষয় এটাও যে, হানাফী মতাবলম্বীরা যখন লা মাজহাবীদেরকে নিজেদের মতের স্বপক্ষে হাদীস দেখায় তখন বেশির ভাগ সময় তারা এই দাবী করে যে, হাদীস বুখারী শরীফ থেকে দেখাতে হবে। অথচ তারাও সত্যিকার অর্থেই জানে যে, প্রত্যেক মাসআলার হাদীস বুখারী শরীফে থাকা আবশ্যক নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে লা-মাজহাবীদের উদ্দেশ্য করে আমাদের সাধারণ হানাফীদের বলা উচিত হলো, আপনারাই কোন আয়াত বা হাদীস পেশ করুন। যাতে এ কথা রয়েছে যে, হাদীস কেবল বুখারী শরীফ থেকেই হতে হবে।

দ্বিতীয়ত তাদের নিকট এই আবেদনও করুন তারা নিজ মতের সকল হাদীস যেন বুখারী শরীফ হতে পেশ করে।

তৃতীয়তঃ তাদেরকে বলুন যে, আপনারা নিজেরাই তো বুখারী শরীফ অনুযায়ী আমল করেন না। আমল করা দূরে থাক আপনাদের বুখারী শরীফের ওপর আস্থাই নেই। দেখুন, বুখারী শরীফের অমুক হাদীসের ওপর আপনাদের আমল নেই। অমুকটি অনুযায়ী আপনারা আমল করেন না। ইমাম বুখারীর অমুক ইজতিহাদ মোতাবেক আপনাদের আমল নেই। অমুকটি মোতাবেকও আমল নেই। প্রমাণ চাইলে 'ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে লা-মাজহাবী' বইটি তাদের সামনে মেলে ধরুন।

এই গ্রন্থে ইমাম বুখারীর মুবারক জীবনী এবং বুখারী শরীফ হতে প্রায় তিপ্পান্নটি মাসআলায় দেখানো হয়েছে যে, আকীদা ও আমলে তারা ইমাম বুখারীর সাথে একমত নন এবং একমত নন বুখারী শরীফে বর্ণিত তাঁর ইজতিহাদসমূহের সাথেও। অধিকন্তু বুখারী শরীফের সকল হাদীস অনুযায়ী আমলও তারা করেন না। বুখারী শরীফে এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো অনুযায়ী তারা আমল তো করেনই না বরং সেগুলোর বিপরীত করে থাকেন।

সম্মানিত পাঠক, বর্তমান সময় ও পরিস্থিতির দাবী তো এই ছিলো যে, সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মহীনতা, ধর্মদ্রোহীতা, খৃষ্টান ও ইহুদীদের ক্রমবর্ধমান ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসা। যেন তারা জগৎবাসীর সামনে মুসলমানদেরকে ক্রীড়নক বানাবার কোন সুযোগ না পায়। কিন্তু আফসোস! আমাদের লা-মাজহাবী ভাইগণ এই ফিতনাপূর্ণ এবং ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কয়েকটি শাখাগত মাসআলায় বাতাস সঞ্চার করতে এবং তার প্রচারকার্যে লিপ্ত রয়েছেন। অধিকন্তু এটাকে তারা ঈমান এবং কুফরের লড়াইয়ের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এর চেয়ে বড় পরিতাপের বিষয় হলো, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলতে তারা কেবল নিজেদেরকেই বোঝেন। বাদবাকী যারা আছে, তাদের সকলকে এরা জাহান্নামী বলে থাকেন। লা-মাজহাবীদের এই সতর্কতারহিত এবং আক্রমণাত্মক পথ ও পন্থা যা তারা দেশে-বিদেশে সর্বত্রই নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে তার জবাবে কিছু বলতে আমাদেরকে বাধ্য করছে। আমার এ বইটিও আগেরগুলোর ন্যায় আক্রমণাত্মক নয় বরং প্রতিরক্ষামূলক। যাতে ভদ্রতা ও সৌজন্য বজায় রেখে শুধু একথা বলা হয়েছে যে, তারা যেন এমন কোন দাবী না করেন যা তারা আমলে আনতে পারবেন না।

বক্ষমান গ্রন্থটি লেখক তিন বছর পূর্বে দেওবন্দে কতিপয় মুখলিস ব্যক্তির অত্যন্ত পীড়াপীড়িবশত লিখতে শুরু করেছিলো। মাঝে নানা বাধা ও ব্যস্ততার দরুন পুস্তকটিকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হতে থাকে। যা এখন আল্লাহ তাআলার তাওফিক ও দয়ায় পূর্ণতা পেয়ে আপনাদের হাতে এসে গেছে। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন পুস্তিকাটি কবুল করে লেখকের নাজাত এবং সর্বসাধারণের হেদায়েতের উসিলা বানিয়ে নেন। এটি লেখা ও মুদ্রিত হয়ে আসা পর্যন্ত যাদের অংশ রয়েছে আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে উপযুক্ত জাযা দান করেন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

আনোয়ার খোরশেদ

প্রারম্ভিকা

সাধারণত দেখা যায় যে, লা-মাযহাবী তথা আহলে হাদীসগণ সম্মানিত হাদীস বিশারদদের মধ্য থেকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস-শাস্ত্রবিদ ইমাম বুখারী রহ. এর প্রতি খুব বেশি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করে থাকে এবং তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ 'বুখারী শরীফকে' অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোন মাসআলার আলোচনা উঠতেই তারা দাবি করে বসে, এর দলীল বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা পেশ করা হোক।

শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক মনের সাথে। আর জানা কথা, মনের উপর কারো ঠিকাদারি চলে না। হৃদয়ে কারও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্ম নেয়া বনী আদমের সহজাত ও স্বতোৎসারিত প্রবৃত্তি, একটি যথার্থ ব্যাপার। তবে শর্ত হলো, ভালবাসাটাও যেন হয় যথার্থ ও সত্যাশ্রয়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লা-মাযহাবী ভাইদের প্রতি আমাদের এই অভিযোগ নেই যে, তারা ইমাম বুখারী রহ. এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করেন কেন ? কিন্তু এ অভিযোগ অবশ্যই আছে যে, তারা এ সম্মান প্রদর্শনে, প্রেমার্ঘ্য নিবেদনে ও ভালবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হলেন কেন ? যেহেতু প্রেম ও ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের দাবি হলো, প্রেমাস্পদের সকল কথা ও কর্মকাণ্ডকে এবং আচার-আচরণকে গ্রহণ করে নেয়া এবং তার সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে, স্বভাব ও স্বকীয়তাকে আপন করে তোলা। এ মর্মেই হযরত রাবেয়া বসরী রহ. এর দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি রয়েছে। যথা -

لو كان حبك صادقا لأطعته * إن المحب لمن يحب مطيع

"যদি তোমার ভালবাসা যথার্থ হত তাহলে অসংকোচে মেনে নিতে প্রেমাস্পদের আনুগত্য। কেননা প্রেমিক মাত্রই তার প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে।"

কিন্তু আমরা যখন বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাকে বাস্তবে যাচাই করতে শুরু করি তখন জানতে পারি যে, লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এ পর্যায়ের নয় যে, তারা ইমাম বুখারীর সকল কথা ও কর্মকে গ্রহণ করবে এবং তাঁর সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বরণ করবে। কেননা, ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনী এবং তার বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কিছু বিরোধপূর্ণ মাসআলা ব্যতীত ইমাম বুখারী রহ. এর সকল আক্বীদায় তাদের ঐকমত্য নেই এবং তা নেই তার সমুদয় আমলের প্রতিও। যখন তাদের আকীদা ও আমলের সাথে সাংঘর্ষিক ইমাম বুখারীর রহ. এর কোন আমল ও আকীদাকে তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন তা তারা গ্রহণ করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। একই অবস্থা হয় যখন তাদের আকীদা ও আমলের বিপরীত বুখারী শরীফের কোন হাদীস বা ইমাম বুখারী রহ. এর কোন ইজতিহাদ তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তখন তারা তা মেনে নিতে চায় না। এমতাবস্থায় ইমাম বুখারী রহ. এর প্রতি তাদের সমুদয় শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসার ভাণ্ড ফতুর হয়ে যায়। তাদের আমলের এ ধরনটিকে বাস্তবেই অভিযুক্ত না করে পারা যায় না। সেই অভিযোগকেই সর্ব সাধারণের সম্মুখে "ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে লা-মাযহাবী" নামে তুলে ধরা হল। এ গ্রন্থে ইমাম বুখারীর পবিত্র জীবনী এবং বুখারী শরীফের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দ্বারা এ বিষয়টি দেখানো হয়েছে যে, আহলে হাদীস সম্প্রদায় মৌখিকভাবে ইমাম বুখারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ অবশ্যই ঘটিয়েছে। কিন্তু তাদের আমল সে দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত। অধম লেখক "হাদীস এবং আহলে হাদীস" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলো- "এ লেখকের নিকট বুখারী শরীফের ঐ সব হাদীস এবং ইমাম বুখারীর সে সকল ইজতিহাদের এক দীর্ঘ সূচী বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোর ওপর আহলে হাদীস সম্প্রদায় আমল করে না। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো না। ইনশাআল্লাহ সে সূচীপত্রটি অন্য কোথাও উল্লেখ করা হবে।"

ইচ্ছে তো ছিল যে, সেই সূচীটি খুব শিগগির পাঠক সাধারণের সামনে নিয়ে আসব। কিন্তু নানা কাজের ব্যস্ততা এ বিষয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আল্লাহ তায়ালার তৌফিক ও সহায়তায় সেই সূচীপত্রটি পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করা হলো। মনে রাখতে হবে যে, বুখারী

শরীফের এ সব হাদীস ও ইজতিহাদের তালিকাটি ভাসা-ভাসা দৃষ্টির ফসল। এর অর্থ এই নয় যে, কেবল উল্লিখিত এ সব হাদীস ও ইজতিহাদ অনুযায়ী আহলে হাদীস সম্প্রদায় আমল করেন না বরং গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে বুখারী শরীফের আরও অনেক হাদীস ও ইজতিহাদ পাওয়া যাবে যেগুলোর প্রতি লা-মাযহাবী সম্প্রদায় বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেন।

সে সকল হাদীস ও ইজতিহাদ উল্লেখ করার পূর্বে পাঠকবৃন্দের সম্মুখে ইমাম বুখারী রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরব। যাতে তার জীবন-প্রদীপের আলোয় এ বিষয়টি দেখে নেয়া যায় যে, ইমাম বুখারীর সাথে লা-মাযহাবী ভাইদের মতৈক্য পোষণের পরিমাণ কতটুকু এবং ইমাম বুখারীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশের স্বরূপটি কী?

আল্লামা আব্দুর রশিদ নোমানী রহ. এর বিশিষ্ট শাগরিদ জামিয়া ইসলামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও মুফতী আল্লামা মাহমুদুল হাসান জামসেদ দা.বা. এর

বাণী ও দোয়া

লা-মাযহাবীরা এ দেশে আহলে হাদীস নামেই সমধিক পরিচিত। তাদের দাবী হলো, তারা সহীহ হাদীস বিশেষত বুখারী শরীফ মেনে চলে। বস্তুত, সাধারণ মুসলমানদের মনে ধর্মের ব্যাপারে নানা দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি করে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধকে বিনষ্ট করতেই এই অপপ্রচার। অন্যথায় সাহাবা-তাবেয়ীন, সালফে সালেহীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ ইমাম বুখারী ও তাঁর বুখারী শরীফের বিরোধীতাই তাদের আসল কৃত্য। পাকিস্তানের মাওলানা আনোয়ার খুরিশদ রচিত– غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں নামক গ্রন্থটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীর নবীন উস্তাদ মাওলানা হারুনুর রশিদ কিতাবটি অনুবাদ করেছেন জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ছি। দোয়া করি মূল গ্রন্থের ন্যায় অনুবাদটিও কবুল করে আল্লাহ তাআ'লা মাওলানাকে দীন ও মিল্লাতের বেশি বেশি খেদমত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আহকর মাহমুদুল হাসান জামসেদ
মুফতী ও মুহাদ্দিস জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী,
ঢাকা-১২০৪

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ইমাম বুখারী র. এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয়

ইমাম বুখারী রহ. এর উপনাম : আবু আবদিল্লাহ, নাম : মুহাম্মাদ এবং পিতা : ইসমাইল। তার বংশ তালিকা নিম্নরূপ : মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন মুগীরা বিন ইব্রাহীম বিন বারদিযবাহ।

ইমাম বুখারীর পরদাদা বারদিযবাহ ধর্মে ছিলেন অগ্নিপূজক। অগ্নিপূজক রূপেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর দাদা মুগীরা এ বংশের প্রথম ব্যক্তি যিনি বুখারার আমীর ইয়ামান জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। সেই ইয়ামান জু'ফীর দিকে সম্বন্ধিত হয়েই তিনি জু'ফী পরিচয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। অন্যথায় জু'ফ বংশের সাথে বাস্তবে তার কোন সম্পর্ক নেই। প্রাচীন আরবে একটি রীতি এই ছিল যে, কেউ কারও হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে, ইসলামে দীক্ষিতকারীর দিকে সম্বোধিত হয়ে তিনি তার সাথেই 'ওয়ালা' সূত্রে আবদ্ধ হতেন। 'ওয়ালার' ক্ষেত্রে হানাফী মাজহাবের বিধান এটিই। তাদের দলীল হলো, আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি–

عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه و مماته –

অর্থ: হযরত তামীম দারী রা. থেকে বর্ণিত- তিনি আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তির বিধান কী, যে কিনা মুসলমানদের মধ্য হতে কারও হাতে ইসলাম গ্রহণ করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ইসলামে দীক্ষিতকারী ব্যক্তিই জীবনে ও মরণে তার সর্বাধিক নিকটবর্তী (বলে গণ্য হবে)। (আবুদাউদ, ২/৪৮)

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন- হযরত ইমাম বুখারী রহ. এর দাদা ইব্রাহীম সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। (হাদইউস-সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী- পৃ: ৪৭৭) তবে তার পিতা ইসমাঈলকে স্বীয় যুগের চতুর্থ স্তরের মুহাদ্দিসগণের দলভুক্ত করা হয়েছে। তিনি ইমাম মালেক, হাম্মাদ বিন যায়দ প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত আলেমগণের শিষ্যত্ব লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের ন্যায় ব্যক্তিত্বের

সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। ইরাকবাসীগণ অধিকাংশ হাদীস তার কাছ থেকেই রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন–

سمع ابي من مالك بن انس و رأي حماد بن زيد و صافح ابن المبارك بكلتا يديه –

অর্থ: আমার পিতা ইমাম মালেক থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, হাম্মাদ বিন যায়দের দর্শন লাভ করেছেন এবং ইবনে মোবারকের সাথে উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২/৩৯২)

ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈল এবং আবু হাফস কাবীরের মাঝে ছিল সীমাহীন ভালবাসা ও ইখলাসের সম্পর্ক। একবার আবু হাফস কাবীর রহ. স্বপ্নে দেখেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। তিনি পোশাক পড়ে আছেন আর একজন মহিলা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- কেঁদো না। যখন আমার ইন্তেকাল হবে, তখন কেঁদো।"

ইমাম আবু হাফস কবীর রহ. বলেন- এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাকে কেউ জানাতে পারলো না। আমি স্বপ্নটির কথা ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈলকে জানাই। তিনি বলেন- এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পরেও তার সুন্নত অবশিষ্ট রয়েছে। (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১০/১৫৭)

হযরত ইসমাঈলের মৃত্যুর সময় ইমাম আবু হাফস তার নিকটেই ছিলেন। এ সময় হযরত ইসমাঈল রহ. ইমাম আবু হাফসকে বলেন–

لا اعلم من مالي درهما من حرام و لا درهما من شبهة

অর্থ: আমার সমুদয় সম্পদের একটি দিরহামও হারাম বা সন্দেহযুক্ত নয়। (হাদইউস-সারী, ৪৭৯)

ইমাম আবু হাফস বলেন- ইসমাঈলের মুখে এ কথা শুনে নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হতে লাগল।

স্মর্তব্য, হযরত হাম্মাদ বিন যায়দ এবং আব্দুল্লাহ বিন মোবারক ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং ইমাম আবু হাফস কাবীর ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদের বিশেষ ছাত্রদেরই একজন।

জন্ম ও শৈশব

ইমাম বুখারী রহ. তৎকালীন নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক শহর বুখারায় ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল জুমার নামাজের পর জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারীর সম্মানিত পিতা ইসমাঈল যেহেতু তার শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন তাই তিনি মায়ের স্নেহভরা কোলেই প্রতিপালিত হন।

ইমাম বুখারী রহ. শৈশবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এতে তার স্নেহশীলা মা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে দোয়া করতে থাকেন যে- ইলাহী, আমার পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। এভাবেই মমতাময়ী মায়ের দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি স্বপ্নে দেখতে পান যে, হযরত ইব্রাহিম আ. তাকে লক্ষ্য করে বলছেন- হে মহিয়সী নারী,

قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك —

অর্থ : তোমার বেশি বেশি দোয়া করার কারণে আল্লাহ তায়ালা তোমার পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি ঘুম থেকে জেগে দেখেন, বাস্তবেই পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে।

ইলম অনুসন্ধান

ইমাম বুখারীর শিক্ষাজীবনের সূচনা ঘটে শৈশব কালেই। প্রাথমিক শিক্ষালাভের সময় হাদীস শরীফের পাশাপাশি তিনি ইলমে ফিক্বাহর প্রতিও মনোযোগী হন। ইমাম ওয়াকেয়ী ও ইবনে মোবারকের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ উস্তাদবৃন্দের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। স্বদেশ বুখারাতেই ইমাম বুখারী রহ. আবু হাফস কাবীরের কাছ থেকে "জামে সুফিয়ান" শ্রবণ করেন। এক্ষেত্রে খতীবে বাগদাদী রহ. নিম্নোক্ত বর্ণনা সূত্রটি উল্লেখ করেছেন-

أخبرني ابو الوليد قال أنبأنا محمد بن احمد بن محمد بن سليمان الحافظ قال أنبأنا ابوعمرو احمد بن عمر المقرئي و ابو نصر احمد بـــن ابي حامـــد الباهلي قالا سمعنا ابا سعيد بكر بن مغير يقول سمعت محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي يقول : كنت عند ابي حفص احمد بن حفـــص

اسمع كتاب الجامع جامع سفيان - في كتاب والدي فمر ابو حفص علـــى حرف ولم يكن عندي ما ذكر فراجعته فقال الثانية كذلك، فراجعته الثانية فقال كذلك، فراجعته الثالثة فسكت سُويعة ثم قال من هذا ؟ قالوا هذا ابن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبة فقال ابو حفص :هو كما قال، و احفظـــوا فان هذا يوما يصير رجلا -

...."মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বিন মুগীরা জু'ফী (ইমাম বুখারী) বর্ণনা করেন যে, আমি আবু হাফস কাবীরের কাছ থেকে জামে' সুফিয়ান শ্রবণ করছিলাম। তখন আমার সম্মুখে এ কিতাবের সে নুসখাটিই ছিল, যা আমার পিতা রেখে গিয়েছিলেন। আবু হাফস হাদীস পড়াতে পড়াতে এমন একটি হরফ উচ্চারণ করেন যা আমার নুসখায় ছিল না। আমি তার সামনে জায়গাটি আমার কিতাবের মত করে পাঠ করলাম। কিন্তু তিনি আগের মত করেই বললেন। আমি দ্বিতীয়বার একই কাজ করলাম। কিন্তু তিনি এবারও আগের মত করেই বললেন। আমি তৃতীয়বার একই কাজ করলাম। এবার তিনি সামান্য কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন- কে হে এই ছেলেটা? লোকেরা বলল- এ হলো ইসমাঈল বিন ইব্রাহীমের পুত্র। এরপর তিনি বলেন- সে যা বলেছে তাই সঠিক। মনে রেখ, ছেলেটি একদিন বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে।"

ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আবু হাফস কাবীরের দরবারে খুব বেশি যাতায়াত করতেন। একবার ইমাম আবু হাফস বলেন-

هذا شاب كيّس ارجو أن يكون له صيت و ذكر ـــ

অর্থ: "ছেলেটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি আশাবাদী যে, কালে তার খুব নাম-ডাক হবে।"

সময়ের বিবর্তনে ইমাম বুখারীর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির সে অবস্থাই ঘটে, যেমনটি তার উস্তাদ আবু হাফস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যেহেতু ইমাম আবু হাফসের সাথে ইমাম বুখারীর পিতার ছিল গভীর সম্পর্ক তাই স্বভাবগতভাবেই এ সুসম্পর্কের ধারা বিদ্যমান থাকে ইমাম বুখারীর সাথেও।

একবার ইমাম আবু হাফস রহ. ইমাম বুখারীর নিকট এই পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য প্রেরণ করেন যে, জনৈক ব্যবসায়ী তা পাঁচ হাজার দিরহাম লাভ দিয়ে ক্রয় করেন। কোন কোন ব্যবসায়ী দ্বিগুণ লাভ দিয়েও তা ক্রয় করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. প্রথম ব্যবসায়ীকে কথা দিয়ে আর তা ভঙ্গ করতে চাননি।

আল্লামা মিয্যী রহ. ইমাম আবু হাফসকে ইমাম বুখারীর উস্তাদগণের তালিকাভুক্ত করেছেন। (তাহযীবুল কামাল, ২৪/৪৩৩)

ঐ সময়ের মধ্যেই ইমাম বুখারী রহ. বুখারার ঐসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শরীফের বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করে ফেলেন যারা আপন শাস্ত্রে অনন্য বলে স্বীকৃত ছিলেন এবং যাদের দরসগাহ্সমূহ ইলমে হাদীস পিপাসু ছাত্রবৃন্দের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। সে সকল মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন সালাম বিকান্দী (মৃ: ২২৫ হি:), আব্দুল্লাহ বিন সালাম মাসনাদী (মৃ: ২২৭ হি:) এবং হারুন বিন আশআছ রহ. এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বুখারী রহ. অল্প বয়সেই এতদূর বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে, অনেক বড় বড় হাদীসের ওস্তাদও তাঁর নাম শুনে সংকুচিত হয়ে উঠতেন। দরসে তাঁর উপস্থিতিতে তারা একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেন কোথাও কোন ত্রুটি প্রকাশ না পায়। আল্লামা বিকান্দি রহ. তো বলেই ফেলেছিলেন যে, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল দরসে উপস্থিত হলে আমার দিশা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয় এবং হাদীস বর্ণনা করতে কেমন যেন ভয়ও করে। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪১৭)

একবার সুলাইম বিন মুজাহিদ রহ. মুহাম্মাদ বিন সালাম বিকান্দী রহ. এর নিকট এলে তিনি বলেন- আরেকটু আগে এলে এমন এক বালককে দেখতে পেতে যার সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ রয়েছে। সুলাইম বিন মুজাহিদ বলেন- আমি এ কথা শুনে খুবই অবাক হই এবং তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। সাক্ষাত হলে তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি দাবি কর যে তোমার সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ রয়েছে ? উত্তরে বালক বুখারী বলেন - কেবল এ সংখ্যকই নয় বরং এর চেয়েও বেশি হাদীস আমার মুখস্থ আছে। শুধু হাদীসের মতন কেন, সনদসূত্রের মধ্য থেকে যাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন তাদের অধিকাংশের আবাসস্থল এবং মৃত্যু তারিখ পর্যন্ত বলে দিতে পারব। এছাড়া আমার বর্ণনাকৃত সাহাবী ও তাবেয়ীগণের

বাণীসমূহের ব্যাপারে এও বলে দিতে পারব যে, সেগুলো কোন কোন আয়াত ও হাদীস থেকে গৃহীত হয়েছে। (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২/৪১৭)

একবার উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন সালাম বিকান্দী রহ. তাঁকে বলেন- তুমি আমার লিখিত হাদীসগ্রন্থটি একবার অধ্যয়ন করে নিও এবং তার কোথাও কোন ভুল পেলে তা শুধরে দিও।" এ কথা শুনে একজন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল যে, কে এই ছেলেটি ? তার প্রশ্নের মর্ম ছিলো- আপনি যুগের ইমাম হয়েও তাকে নিজের ভুলগুলো শুধরে দেয়ার কথা বলছেন ! উত্তরে ইমাম বিকান্দী রহ. বলেন - তার কোন দ্বিতীয় এবং প্রতিপক্ষ নেই।

(তাহযীবুল কামাল, ২৪/৪৫৯)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা দাখেলীও বুখারায় হাদীস শরীফের দরস প্রদান করতেন। ইমাম বুখারী রহ. তার হালকায়ে দরসেও অংশ গ্রহণ করতেন। একদিন এমন হলো যে, উস্তাদ দাখেলী হাদীসের সনদ বর্ণনাকালে বললেন- সুফিয়ান আবু যুবায়ের থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তৎক্ষণাৎ বালক বুখারী বলে ওঠেন, সনদসূত্রটি এমন হতে পারে না। কেননা, আবু যুবায়ের ইব্রাহীম থেকে রেওয়ায়েত করেননি। মুহাদ্দিস দাখেলী ইমাম বুখারীকে অবোধ শিশু ভেবে ধমক দিয়ে বসেন। কিন্তু তিনি ভদ্রতার সাথে আরজ করলেন, যদি আপনার নিকট হাদীসের মূল পাণ্ডুলিপিটি থেকে থাকে তবে তা একটু দেখে নিন। এতে তিনি স্বস্থানে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটি বের করলেন এবং দেখলেন ইমাম বুখারীর কথা ঠিকই ছিল। তিনি ফিরে এসে বললেন - হে বালক, তাহলে সনদটি বাস্তবে কেমন হবে ? ইমাম বুখারী বললেন, সনদটি হবে এমন- আ'দীর পুত্র যুবায়ের ইব্রাহীম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।" এরপর উস্তাদ দাখেলী ইমাম বুখারীর কাছ থেকে কলম নিয়ে স্বীয় কিতাবের এ জায়গাটি ঠিক করে নেন এবং বলেন - তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে। কেউ ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করেন যে, যখন এ ঘটনা ঘটে তখন আপনার বয়স কত ছিল ? তিনি বলেন- এগার বছর। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৩৯৩)

হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ

বুখারার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রায় ছয় বছর ইল্‌ম হাসিল করার পর ২২০ হিজরীতে যখন তার বয়স প্রায় পনের-ষোল বছর, তখন তিনি নিজের মা ও ভাই আহমাদের সাথে মক্কা মুকাররমায় গমন করেন এবং

হজ্ব সম্পাদন করার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। মা ও ভাই বুখারায় ফিরে আসেন। আর তিনি সেখানেই জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। পবিত্র মক্কায় তিনি দু' বছর অবস্থান করেন এবং এখানকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীনে কেরাম যেমন- আবু আব্দুর রহমান আল মুক্বরী (ইমাম আবুহানিফার ছাত্র), হাস্‌সান বিন হাস্‌সান বিসরী, আবুল ওয়ালীদ আহমাদ বিন আযরাক্বী এবং ইমাম হুমাইদী রহ. এর কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। মক্কা শরীফের জ্ঞান সাধকদের কাছ থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার পর ২১২ হিজরীতে আঠার বছর বয়সে তিনি মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন, এখানে তিনি আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ উআইসী, আইয়ুব বিন সুলাইমান বিন হেলাল, ইসমাঈল বিন আবু উয়াইস প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২/৩৯৫)

হারামাইন শরীফাইন ব্যতীত হাদীস অন্বেষণে তিনি শাম, ইরান, ইরাক, মিশর, জাজিরা প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে গমন করেন এবং সেখানকার হাদীসবেত্তাদের নিকট থেকে পবিত্র হাদীসের-ভাণ্ডার অর্জন করেন। তিনি নিজে বলেন -

دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين والى البصرة اربع مرات واقمت بالحجاز ستة اعوام ولااحصي كم دخلت الى الكوفة وبغداد مع المحدثين.

অর্থ: আমি শাম, মিশর এবং জাজিরায় দু'বার গিয়েছি। বসরায় গিয়েছি চার বার। পবিত্র হিজাজে ছয় বছর অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে মুহাদ্দিসগণের সাথে কতবার যে গিয়েছি তার হিসেব দিতে পারব না। (হাদইউস - সারী, ৪৮৭)

বসরা

বসরায় তিনি ইমাম আবু আসেম আন-নাবিল (আবু হানিফার রহ. ছাত্র), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (আবু হানিফার ছাত্র), আব্দুর রহমান বিন হাম্মাদ শুআইছী, মুহাম্মাদ বিন আ'রআ'রাহ, হাজ্জাজ বিন মিনহাল, বদল বিন মুহাব্বার, আব্দুল্লাহ বিন রজা', সাফওয়ান বিন ঈসা, হারামী বিন আম্মারাহ, আফফান বিন মুসলিম, সুলাইমান বিন হারব্‌, আবুল ওয়ালিদ আত-তৃয়ালিসী (ইমাম আবু ইউসুফের শিষ্য), মুহাম্মাদ বিন সিনান প্রমুখ মুহাদ্দিসীনের নিকট ইলমে হাদীস অর্জন করেন।

কূফা

কূফার উবাইদুল্লাহ বিন মুসা (আবু হানিফার ছাত্র), আবু নুআইম ফযল বিন দুকাইন (আবু হানিফার ছাত্র), খালেদ বিন মাখলাদ, ত্বলক্ব বিন গাননাম, খালেদ বিন ইয়াযিদ আল-মুক্বরী, আহমাদ বিন ইয়াকুব, আসমা বিন আবান, হাসান বিন রবী', সায়ীদ বিন হাফ্স, উমর বিন হাফ্স, ক্বীসা বিন উক্ববা প্রমুখ মাশায়েখে কেরাম থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন।

বাগদাদ

তিনি বাগদাদে আহমাদ বিন হাম্বল (ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র), মুহাম্মাদ বিন সাবেক, মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন ত্বাবা', সুরাইজ বিন নু'মান প্রমুখ মুহাদ্দিসীনের নিকট ইলমে হাদীস অর্জন করেন। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন-ইমাম বুখারী রহ. মোটের বিচারে এক হাজার মাশায়েখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২/৩৯৫)

স্মর্তব্য, হাদীস শ্রবণ ও ইল্‌ম অর্জনের এ সকল সফরে ইমাম আবু হাফস কাবীর হানাফী রহ. এর সুযোগ্য পুত্র ইমাম আবু হাফস ছগীর হানাফী রহ. ছিলেন (মৃ: ২৬৪) ইমাম বুখারী রহ. এর সহপাঠী ও সহচর। সে মতে ইমাম যাহাবী লিখেন -

و رافق البخاري في الطلب

অর্থাৎ- তলবে ইলমের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হাফস ছগীর হানাফী রহ. দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইমাম বুখারী রহ. এর সফরসঙ্গী ছিলেন।

জ্ঞাতব্য ঃ সম্মানিত পাঠক, ইমাম বুখারী রহ. এর শৈশব, জ্ঞানান্বেষণ এবং হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে তার সফরসমূহের আলোচনা দ্বারা দুটি বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এক, হানাফী আলেমগণের সাথে ইমাম বুখারীর খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। এ কারণেই ইমাম আবু হাফস কাবীরের সাথে ইমাম বুখারীর পিতা হযরত ইসমাঈলের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। তিনি এ কারণেই আবু হাফস কাবীরের নিকট জামে' সুফিয়ান শ্রবণ করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তার প্রতি ছিল ইমাম আবু হাফসের পূর্ণ মনোযোগ। এরই পরিণামে ইমাম আবু হাফস বালক বুখারী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যার বাস্তবতা আজ সমগ্র পৃথিবী প্রত্যক্ষ করছে। আর এরই ফলে ইমাম আবু হাফস কাবীর রহ. তার জন্যে আর্থিক সহযোগিতার হাত উন্মুক্ত রাখেন এবং পুত্র আবু হাফস ছগীর দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার সফরসঙ্গীর অভাব পূরণ করতে থাকেন। ইনি সেই আবু হাফস ছগীর যার ব্যাপারে আল্লামা যাহাবী বলেছেন-

كان ثقة اماما ورعا زاهدا ربّانيا صاحب سنة و اتباع

অর্থাৎ- তিনি হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত ছিলেন। ছিলেন যুগের ইমাম, অত্যন্ত খোদাভীরু, দুনিয়া বিমুখ, খোদা-প্রেমী আলেম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ ও অনুকরণে পূর্ণ নিবেদিত। (সিয়ারু আ'লামিন - নুবালা, ১২/৬১৮)

পিতা-পুত্রের এ দুজনকেই হানাফী মাজহাবের বর্ষীয়ান ফুক্বাহায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য করা হয়। বুখারায় ফিক্বহে হানাফীর জ্ঞানের রাজ্যে এঁরাই ছিলেন শিরোপার অধিকারী (বা এ দুজনের দ্বারাই তা পূর্ণতা লাভ করে)।

ইমাম বুখারী রহ. জ্ঞানান্বেষার প্রাথমিক যুগে ইমাম ওয়াকেয়ী' এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের কিতাবাদি কণ্ঠস্থ করে ফেলেন এবং পাঠ গ্রহণ করেন জামে' সুফিয়ান নামক হাদীস-গ্রন্থ। আর এগুলো ছিল ফিক্বহে হানাফীর বিন্যাসভিত্তিক হাদীস সংকলন। কেননা, ইমাম ওয়াকেয়ী' এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক উভয়ে ছিলেন ইমাম আবু হানিফার বিখ্যাত ছাত্র এবং হানাফী মাজহাবের অনুসারী। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহ. ইমাম আবুহানীফা রহ. এর দরসে অংশ নিয়েছেন এবং তার থেকে তিনি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তবে হানাফী ফিক্বাহ তিনি আত্মস্থ করেছিলেন আলী বিন মুসহির রহ. এর কাছ থেকে (মৃ: ১৮৯ হি:), যিনি ছিলেন ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. তার জামে' সংকলনের ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকেই অধিক সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। একারণেই ইয়াযিদ বিন হারূন বলেছেন-

كان سفيان يأخذ الفقه عن على بن مسهر من قول ابي حنيفة و ستعان به و بمذاكرته على كتابه هذا الذي سماه الجامع (مقدمة كتــاب التعلــيم مسعود بن شيبة صـــ١٣٣)

অর্থাৎ সুফিয়ান ছাওরী ফিক্বহে হানাফীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন আলী বিন মুসহিরের নিকট। তার সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে এবং তার সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করেই তিনি তার এ জা'মে সংকলন করেছিলেন।

দুই. পবিত্র মক্কা-মদীনার ইলমী সফর শেষে ইমাম বুখারী রহ. ইরাকে গমন করেন এবং বসরা, কুফা, বাগদাদ প্রভৃতি শহরের মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট হাদীস শরীফের জ্ঞান অর্জন করেন। তার উক্তি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমি বসরা গিয়েছি চারবার। আর কুফা ও বাগদাদে এতবার গিয়েছি যে, তার গণনা করা সম্ভব নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইরাকের ইলমে হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে পারার গুরুত্ব তার নিকট কত বেশি ছিল। তিনি সেখানকার মুহাদ্দিসীনে কেরামকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। তিনি ইরাকের বহু মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। যাদের অনেকেই ছিলেন ইমাম আবু হানিফা বা তার শাগরেদ কাজী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের শিষ্য। তাদের অনেকে ছিলেন আবার কট্টর হানাফী মাজহাব অনুসরণকারী। সেই ইরাকী হাদিসগুলো তার নিকট এতই গুরুত্ববহ মনে হয়েছে যে, তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত বুখারী শরীফের স্থানে স্থানে তা উল্লেখ করেছেন।

কুফার ইলমী অবস্থান

এখানে কুফার ইলমী পরিবেশ ও অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করলে অসংগত হবে না। বরং তা হবে একান্ত স্থানোপযোগী যুক্তিসংগত। একটু ভেবে দেখা উচিৎ যে কুফায় কোন সমস্ত লোকের বসতি গড়ে উঠেছিলো। সেখানকার ইলমী অবস্থানই বা ছিল কিরূপ যে, ইমাম বুখারীর মত মানুষকে সেখানে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার জন্যে বার বার যেতে হয়েছিল। আমি যখন এ বিষয়ের ইতিহাস নিয়ে বেশ ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলাম তখন অনেক উপকারী ও গুরুত্ববহ বিষয়ে অবগতি লাভ করি। এখানে আমার অবগতিলব্ধ সেই বিষয়গুলোকে পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পাব। ইতিহাস সাক্ষী যে, ফারুকে আজম হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর খিলাফত আমলে যখন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ইরাক বিজয় করেন তখন খলিফা হযরত উমর (রা.) কুফায় জনবসতি গড়ে তোলার নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৭ হিজরীতে কুফা শহরের গোড়াপত্তন ঘটে। এর চতুর্দিকে ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বিশুদ্ধ

আরবীভাষীদের আবাসন গড়ে ওঠে। এ শহর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এখানে বিখ্যাত অনেক সাহাবীর আগমন ঘটে।

কুফায় সাহাবায়ে কেরামের আগমন

আল্লামা ইবনে সা'দ রহ. বলেন, সত্তর জন বদরী এবং তিনশ জন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী কুফা শহরে তাশরীফ এনেছিলেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৬/৯)

হাফেজ আবু বিশর দুলাবী রহ. (মৃ: ৩১০ হিঃ) তাবেয়ী হযরত কাতাদার সনদে বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক হাজার পঞ্চাশ জন সাহাবী এবং চব্বিশ জন বদরী সাহাবী কুফায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। (কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা ১৭৪ পৃঃ) ইমাম আবুল হাসান আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আজালী রহ. (মৃঃ ২৬১) বলেন, কুফায় দেড় হাজার সাহাবীর আগমন ঘটেছিলো। আল্লামা ইবনে সা'দ রহ. কুফা সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর মন্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে-

بالكوفة وجوه الناس

'কুফায় উঁচুদরের মানুষ বাস করে।'

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত উমর (রা.) যাদের ব্যাপারে উঁচুদরের শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তা একমাত্র তাদের দ্বীনী ও ইলমী দিক বিবেচনায় রেখেই করেছেন। বিষয়টির দৃঢ় সমর্থন মেলে কুফাবাসীর উদ্দেশে প্রেরিত হযরত উমরের নিম্নোক্ত পত্র দ্বারা

اني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا و عبد الله بن مسعود معلما و وزيرا و هما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم من أهل بدر فاقتدوا بهما و اسمعوا و قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي .

অর্থ: আমি তোমাদের নিকট আম্মার বিন ইয়াসেরকে আমীর রূপে ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে শিক্ষক ও পরামর্শদাতা হিসেবে প্রেরণ করলাম। এদের দুজনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে বিশেষভাবে নির্বাচিত এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তোমরা তাদের অনুগত থাকবে এবং তাদের কথা মেনে চলবে। মনে রেখ! আমি

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের ব্যাপারে তোমাদেরকে আমার নিজের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কুফা নগরীর সূচনাকাল থেকে নিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত আমলের শেষাবধি কুফাবাসীদেরকে কুরআন শরীফ এবং ফিক্বহী মাসায়েলের শিক্ষা দানেই ব্যাপৃত ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে কারী, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসগণের প্রাচুর্যে কুফা শহর মালামাল হয়ে ওঠে। কতিপয় নির্ভরযোগ্য আলেমের মতে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের অক্লান্ত মেহনতের বদৌলতে কুফা শহরে গড়ে ওঠে চার হাজার আলেমের এক বিশাল জামাত। এই মহৎ কাজে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন বিশিষ্ট অনেক সাহাবী। যথা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) হুজায়ফা বিন ইয়ামান, আম্মার বিন ইয়াসের, সালমান ফারসী, আবু মূসা আশআরী (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। হযরত আলী (রা.) যখন স্থানান্তরিত হয়ে কুফায় এলেন তখন সেখানে ফুকাহায়ে কেরামের এক বিরাট জামাত দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন–

رحم الله ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ইবনে মাসউদের প্রতি দয়া করুন।তিনি ইলম দ্বারা এ শহরকে প্রাচুর্যমণ্ডিত করে গেছেন।

ইমাম আবু বকর দাউদ ইয়ামেনী রহ. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের ইন্তেকালের পরে হযরত আলী (রা.) কুফায় আগমন করেন। সময়টি ছিল এমন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের শিষ্যবর্গ সেখানকার লোকদেরকে আলেম ও ফক্বীহ হিসেবে গড়ে তোলার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রা.) কুফার জামে মসজিদে এসে দেখেন, সেখানে স্থানে স্থানে রাখা আছে প্রায় চারশত কালির দোয়াত আর ছাত্ররা রয়েছে লেখার কাজে ব্যস্ত। এ দৃশ্য অবলোকন করে তিনি সহসা বলে ওঠেন-

لقد ترك ابن أم مكتوم هولاء سرج الكوفة

অর্থ: ইবনে উম্মে মাকতুম (ইবনে মাসউদের ডাক নাম) দেখছি এদেরকে কুফায় প্রদীপ হিসেবে রেখে গেছেন। ইমাম আবু বকর জাসসাস রাযী রহ. লিখেছেন যে–

خرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين و فقهاؤه فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بالاهواز ثم بالبصرة ثم بدير الجماجم من ناحية الفراة بقرب الكوفة

অর্থ : চার হাজার আলেম ওলামা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করেন। তারা ছিলেন তাবেয়ীগণের মধ্যে সর্বোত্তম এবং ফিক্বাহ শাস্ত্রে পারদর্শী। এরপর তারা আহওয়াজ নামক স্থানে আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদের নেতৃত্বে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এরপর যুদ্ধ করেন বসরায়। এরপর কুফার নিকটবর্তী ফুরাত নদীর তীরে দীরুল জামাজিম নামক স্থানে। (আহকামুল কুরআন, ১)

আবু মুহাম্মদ রামাহুরমুযী রহ. (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) নিজের সনদসূত্রে ইমাম আনাস ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে সীরীন বলেছেন-

اتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث وأربعة مأة قد فقهوا

অর্থ: আমি কুফায় এসে চার হাজার হাদীসের ছাত্র এবং চারশত ফিক্বাহ শাস্ত্রবিদের দর্শন লাভ করেছি। (আল-মুহাদ্দিসুল ফাসেল, ৫৬০) ত্বাবাকাতে ইবনে সা'দের ৬ষ্ঠ খণ্ডের পুরোটা জুড়ে কেবল কুফার আলেম ওলামাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন যুগের জ্ঞান সাধকদের জীবনীর প্রতি দীর্ঘ আলোকপাত করা হয়েছে। আমি আপাতদৃষ্টিতে এই ত্বাবাকাত অধ্যয়ন করেও কুফার আলেম ওলামার সংখ্যা পেয়েছি প্রায় এক হাজার অথচ এই গ্রন্থের অন্যান্য শহরের আলেম ওলামার সংখ্যা তার এক দশমাংশেও পৌঁছে না। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম হাকেম রহ. তার "মারিফাতু উলুমিল হাদীস" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইসলামী শহরগুলোর নামকরা মুহাদ্দিসগণকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে, সকল শহরের মধ্যে এ বিরল সম্মাননা কেবল কুফারই রয়েছে যে, তার বুকে অবস্থানকারী হাদীসের ইমামগণের আলোচনা এ গ্রন্থের পুরো সাড়ে তিন পৃষ্ঠা জুড়ে এসেছে। যেখানে অন্য সব শহরের আয়িম্মায়ে হাদীসের অলোচনা এক পৃষ্ঠার অধিক নয়। হাফেজ আবু মুহাম্মাদ রামাহুরমুযী রহ. ধারাবাহিক

সনদ সহকারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আফফান বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন যে, আমি অমুক মুহাদ্দিসের কিতাব লিখে ফেলেছি এবং অমুক মুহাদ্দিসের কিতাব লিখে ফেলেছি। এতে তিনি মন্তব্য করেন যে, আমার ধারণা এ ধরনের মানুষেরা সফল হতে পারে না। আমাদের নিয়ম তো এই ছিল যে, আমরা যখন কোন উস্তাদের নিকট যেতাম তখন তাঁর কাছ থেকে এমন সব রেওয়ায়েতই শুনতাম যা অন্য কারও নিকট শুনিনি। অন্য আরেক উস্তাদের নিকট গিয়ে তার ঐ সব বর্ণনাই শুনতাম যা প্রথম জনের কাছে শুনতে পাইনি। সুতরাং আমরা কুফায় এসে চারমাস অবস্থান করলাম। ইচ্ছে করলে আমরা এখানে চার লক্ষ হাদীস লিখে নিতে পারতাম। কিন্তু লিখেছি মাত্র পঞ্চাশ হাজার হাদীস। আমরা যে উস্তাদের কাছেই গিয়েছি তার নিকট হাদীস শ্রবণের সাথে সাথে তা লিখে নেয়ারও অনুমতি নিয়েছি। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে কেবল হযরত শরীক রহ.-এর নিকট। তিনি আমাদেরকে ইমলা অর্থাৎ লিখে নেয়ার সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। উল্লেখ্য, আমরা কুফা শহরে কোন ব্যক্তিকে আরবী বাকরীতির অশুদ্ধ প্রয়োগ ঘটাতে কিংবা এ ভাষার সাথে আনাড়িসুলভ আচরণ করতে দেখিনি। (আল-মুহাদ্দিসুল ফাসেল, ৫৫৭) আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী রহ. (মৃ: ৭৭১ হি:) "তাবাক্বাতে শাফেঈয়্যাহ" নামক গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদের পুত্র হাফেজ আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আবু দাউদের (মৃ: ৩১৬ হি:) জবানিতে এ কথাগুলো লিখেছেন যে, "আমি যখন কুফায় এলাম, তখন আমার নিকট মাত্র একটি দিরহাম ছিল। আমি তা দিয়ে ত্রিশ মুদ বাকিল্লা ক্রয় করি এবং প্রতিদিন এক মুদ করে খেতে থাকি। এ অবস্থায় ইমাম আবু সাঈদ আল-আশাজ্জের (ইনি সিহা-সিত্তার সংকলকদের উস্তাদ) নিকট প্রতিদিন এক হাজার করে ত্রিশ দিনে ত্রিশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করে ফেলি। অবশ্য এগুলোতে মাক্বতু' ও মুরসাল পর্যায়ের হাদীসও ছিল। (ত্বাবাকাতে শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, ৩/৩০৮)"। চিন্তা করে দেখুন! এই শহরটি ইলমে হাদীসে এতই উন্নত ছিল যে, আফফান বিন মুসলিমের ন্যায় হাদীসের ইমাম মাত্র চার মাসে পঞ্চাশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং হাফেজ আবু বকর বিন আবু দাউদ এক মাসে সংগ্রহ করেছিলেন ত্রিশ হাজার হাদীস। ইমাম আহমাদ

বিন হাম্বলকে যখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনার মতে একজন ছাত্রের কী করা উচিৎ? সে কি একজন উস্তাদের সান্নিধ্যে থেকেই হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকবে, নাকি ইলমী চর্চা আছে এমন সব শহরে গিয়ে সেখানকার আলেম ওলামার কাছ থেকে উপকৃত হতে থাকবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, তার সফর করা কর্তব্য এবং অন্যান্য স্থানের আলেমগণের নিকট অবস্থান করে হাদীসসমূহ লিখে নেয়া উচিৎ। সেই আলেমদের মধ্যে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. সর্বাগ্রে কুফার ওলামায়ে কেরামের কথাই উল্লেখ করেছেন। তার যথার্থ সেই প্রস্তাবের শব্দ-সমষ্টিকে নিম্নে তুলে ধরা হলো-

يرحل و يكتب من الكوفيين والبصريين و اهل المدينة و مكة

অর্থ: তালিবে ইলমের কর্তব্য হলো সে সফর করবে এবং কুফা, বসরা, মদীনা ও মক্কাবাসী আলেমদের সান্নিধ্যে গিয়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করবে। আল্লামা ইবনে সা'দ রহ. স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল জাব্বার বিন আব্বাস (রহ.)-এর পিতা আব্বাস থেকে রিওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন-

جالست عطاء فجعلت اسئل فقال لي ممن أنت ؟ فقلت من أهل الكوفة ، فقال عطاء ما يأتينا العلم إلا من عندكم

অর্থ: আমি হারাম শরীফের ইমাম এবং মক্কার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত আতা বিন আবি রাবাহ রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোন শহর থেকে এসেছ? আমি বললাম কুফা থেকে। তিনি বললেন (আশ্চর্য তুমি আমাদের নিকট মাসআলা জানতে চাইছ!) আমরা তো তোমাদের কাছ থেকেই ইলম অর্জন করেছি। (তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৬/১১)

হযরত আতা বিন আবি রাবাহ রহ. হারাম শরীফের ইমাম, মক্কার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ হওয়ার পাশাপাশি একজন মুজতাহিদও ছিলেন এবং ছিলেন অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের শায়েখ ও উস্তাদ। তাঁর এ মর্মে স্বীকারোক্তি যে, "আমরা কুফাবাসীর কাছ থেকেই জ্ঞান অর্জন করেছি" তৎকালীন কুফা নগরীর ইলমী অগ্রগণ্যতার স্পষ্ট ও মস্ত বড় দলীল।

তাযকিরাতুল হুফফায এবং কুফার মুহাদ্দিসীন

হাদীস বিশারদগণ কেবল হাফেযে হাদীসদের জীবনচরিত নিয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। সে সব গ্রন্থে কেবল ঐ সকল মানুষকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, যারা নিজ নিজ যুগে হাদীসের হাফেজ ছিলেন। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো তাযকিরাতুল হুফফায। এর রচয়িতা হলেন হাফেজ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রহ.। তিনি এ গ্রন্থে এমন কাউকে নিয়ে আলোচনা করেননি, যাকে হাফেযে হাদীস বলে গণ্য করা হয় না। এ কারণে তিনি আল্লামা কুতায়বা সম্পর্কে লিখেন-"ইবনে কুতায়বা ইলমের খনি বটে; কিন্তু হাদীসের খেদমতে তার অবদান যেহেতু অপ্রতুল তাই এ গ্রন্থে তাকে নিয়ে আলোচনা করা হলো না"।

(তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৬৩৩)

খারেজা বিন যায়দ যদিও মক্কার সাত ফুক্বাহার একজন ছিলেন, কিন্তু আল্লামা যাহাবী রহ. তার ব্যাপারে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, "তার জ্ঞাত হাদীসের সংখ্যা যেহেতু নিতান্ত কম তাই আমি হাফেযে হাদীসদের তালিকায় তার নামটি উল্লেখ করিনি। এমনিভাবে এ গ্রন্থে ঐ সকল মানুষের নামও আনা হয়নি, যারা হাফেযে হাদীস বটে; কিন্তু হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে বরিত নন। ফলে আল্লামা যাহাবী রহ. ইমাম ওয়াক্বেদী ও হিশাম কালবীকে হাফেযে হাদীস গণ্য করেন নি। এই গ্রন্থে ২৫৬ হি: (ইমাম বুখারীর মৃত্যু সন) পর্যন্ত আগত মুহাদ্দিসগণের আলোচনা পাঠ করে দেখুন, এদের মধ্যে আল্লামা যাহাবী রহ. কতজনকে কুফাবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টির জ্ঞাতার্থে আমরা এখানে কেবল ঐ সকল মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করব যাদের নামে তিনি পৃথক পৃথক শিরোনাম স্থাপন করেছেন। নামগুলো নিম্নরূপ-

(১) ইমাম আলকামাহ বিন কায়স (মৃ: ৬২ হি:) (২) মাসরূর আল হামদানী (৬৩হি:) (৩) আল-আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ আন-নাখয়ী (৭৫ হি:) (৪) উবাইদা বিন আমর আস-সালমানী (৭২ হি:) (৫) সুওয়াইদ বিন গাফালা আল-কুফী (৮১ হি:) (৬) যির বিন জাইশ আবু মরিয়াম আল-আসাদী (৮২ হি:) (৭) আব্দুর রহমান বিন আবি ইয়াযিদ আছ-ছাওরী (৬৩ হি:) (৮) আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা (৭৩ হি:) (৯) আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী (৭৩ হি:) (১০) আবু উমাইয়া শুরাইহ বিন

হারেছ (৭৮ হি:) (১১) আবু মিকদাম শুরাইহ আল-মাযহাজী (৮৭ হি:) (১২) আবু শাক্বীক বিন সালামা (৮২ হি:) (১৩) কায়েস বিন আবি হাযেম (৯৭ হি:) (১৪) আমর বিন মায়মুন আবু আব্দুল্লাহ (৭৫ হি:) (১৫) যায়দ বিন ওয়াহহাব আবু সুলায়মান (৮৪ হি:) (১৬) মারূর বিন সুওয়াইদ আল-আসাদী (১২০ হি:) (১৭) সাদ বিন ইয়াস আশ-শাইবানী (৯৮ হি:) (১৮) রিবী বিন হাররাশ (১০১ হি:) (১৯) ইবরাহীম বিন যায়দ আত-তাইমী (৯২ হি:) (২০) ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আন-নাখয়ী (৯৫ হি:) (২১) সাঈদ বিন জুবাইর (৯৫ হি:) (২২) আমের বিন শারাহীল আল-হামদানী (১০৪ হি:) (২৩) আবু ইসহাক আমর বিন আব্দুল্লাহ (১২৭ হি:) (২৪) হাবীব বিন আবু ছাবেত (১১৯ হি:) (২৫) আল হাকাম বিন উতাইবা আল-কিনদী (২৬) আমর বিন মুররাহ (১১১ হি:) (২৭) আল-কাসেম বিন মুখাইমিরাহ (১১৬ হি:) (২৭) আল-কাসেম বিন মুখাইমিরাহ (১১১ হি:) (২৮) আবদুল মালেক বিন উমাইর (২৯) মানসুর ইবনুল মু'তামার (১৩২ হি:) (৩০) মুগীরা বিন মুক্বসিম (১২৬ হি:) (৩১) হুসাইন বিন আব্দুর রহমান (১২৬ হি:) (৩২) সুলাইমান বিন ফাইরূয (১৩৮ হি:) (৩৩) ইসমাঈল বিন আবু খালেদ (১৪৫ হি:) (৩৪) সুলাইমান বিন মিহরান আল- আ'মাশ (১৪৮ হি:)। (৩৫) আবদুল মালিক বিন সুলাইমান (১৪৫ হি:) (৩৬) নুমান বিন ছাবেত আবু হানিফা (১৫০ হি:) (৩৭) মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা (১৪৮ হি:) (৩৮) হাজ্জাজ বিন আরতাত (১৪৯ হি:) (৩৯) মিসআর বিন কিদাম আল-হামদানী (১৭৫ হি:) (৪০) আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল-মাসউদী (১৬০ হি:) (৪১) সুফিয়ান বিন সাঈদ আছ-ছাওরী (১৬১ হি:) (৪২) ইসরাঈল বিন ইউনুস আস-সাবীঈ (১৬২ হি:) (৪৩) যায়েদা বিন কুদামা (১৬১ হি:) (৪৪) আল হাসান ইবনু সালেহ (১৬৭ হি:) (৪৫) শায়বান বিন আব্দুর রহমান (১৬৪ হি:) (৪৬) ক্বায়স ইবনুর রবী (১৬৭ হি:) (৪৭) ওয়ারাক্বা বিন আমর (১৬০ হি:) (৪৮) ক্বাযী শারীক বিন আব্দুল্লাহ (১৭৭ হি:) (৪৯) যুহাইর বিন মুআবিয়া (১৭৩ হি:) (৫০) আল-কাসেম বিন মা'ন (১৭৫ হি:) (৫১) সালাম বিন সুলাইম (১৯৭ হি:) (৫২) বিশর ইবনুল কাসেম (১৭৮ হি:) (৫৩) সুফিয়ান বিন উয়াইনা (১৯৮ হি:) (৫৪) আবু বকর বিন আইয়াশ (১৯৩ হি:) (৫৫) ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (১৮২ হি:) (৫৬) আবদুস-

সালাম ইবনু হারব (১৮৭ হি:) (৫৭) জারীর বিন আবদুল হামিদ (১৮৮ হি:) (৫৮) সুলাইমান বিন হিব্বান (১৯৮ হি:) (৫৯) ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ (১৮৫ হি:) (৬০) ঈসা বিন ইউনুস (১৮৭ হি:) (৬১) আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস (১৯২ হি:) (৬২) ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান (১৮৯ হি:) (৬৩) হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান (১৯০ হি:) (৬৪) আলী বিন মুসহির (১৮৬ হি:) (৬৫) আব্দুর রহিম বিন সুলাইমান (১৮৭ হি:) (৬৬) ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আল-আনসারী (২০৮ হি:) (৬৭) মুহাম্মাদ বিন হাযেম (১৯৫ হি:) (৬৮) মারওয়ান বিন মুআবিয়া (১৯৩ হি:) (৬৯) হাফস বিন গিয়াস আন-নাখয়ী (১৯৪ হি:) (৭০) ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (১৯৭ হি:) (৭১) উবাইদা বিন হুমাইদ (১৯০ হি:) (৭২) উবাইদুল্লাহ আশজায়ী (১৮২ হি:) (৭৩) আবাদাহ বিন সুলাইমান (১৮৮ হি:) (৭৪) আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ (১৯৫ হি:) (৭৫) মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল (১৯৫ হি:) (৭৬) হাম্মাদ বিন উসামা (২০৩ হি:) (৭৭) মুহাম্মাদ বিন বিশর (২০৩ হি:) (৭৮) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কুরাশী (১৯৪ হি:) (৭৯) ইউনুছ বিন বুকাইর (১৯৯ হি:) (৮০) আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর (১৯৯ হি:) (৮১) সুজা ইবনুল ওলীদ (২০৪ হি:) (৮২) মুহাম্মাদ বিন উবাইদ আল-আয়াদী (২০৪ হি:) (৮৩) আব্দুল্লাহ বিন দাউদ আল-খারীবী (২১৩ হি:) (৮৪) হুসাইন বিন আলী (২০৩ হি:) (৮৫) যায়দ ইবনুল হুবাব (২০৩ হি:) (৮৬) উবাইদুল্লাহ বিন মুসা (২১৩ হি:) (৮৭) ইসহাক বিন সুলাইমান (২০০ হি:) (৮৮) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (২০৩ হি:) (৮৯) ইয়াহইয়া বিন আদম (২০৩ হি:) (৯০) দাউদ বিন ইয়াহইয়া (২০৩ হি:) (৯১) আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (২১৩ হি:) (৯২) আবু নুআইম আল-ফজল বিন দুকাইন (২১৯ হি:) (৯৩) কুবাইসা বিন উক্ববা (২১৫ হি:) (৯৪) মুসা বিন দাউদ (২১৭ হি:) (৯৫) খালাফ বিন তামীম (২০৬ হি:) (৯৬) ইয়াহইয়া বিন আবু বুকাইর (২০৮ হি:) (৯৭) উবাইদুল্লাহ (২০৩ হি:) (৯৮) যাকারিয়া বিন আদী (২১২ হি:) (৯৯) আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস (২২৭ হি:) (১০০) মালেক বিন ইসমাঈল (২১৭ হি:) (১০১) খালেদ বিন মুখাল্লাদ (২১৩ হি:) (১০২) ইয়াহইয়া বিন আবদুল হামীদ (২৩৫ হি:) (১০৩) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (২৩৪ হি:) (১০৪) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর (২৩৪ হি:) (১০৫) উসমান বিন আবু শাইবা (২৩৯ হি:) (১০৬) আলী বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (২৩৩ হি:) (১০৭) আহমাদ বিন হুমাইদ (২২০ হি:) (১০৮) আল-হাসান ইবনুর রবী (২২১ হি:) (১০৯) মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (২৪৮ হি:) (১১০) হান্নাদ ইবনুস সারী (২৪৩ হি:)

সম্মানিত পাঠক! উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আশা করি আপনি জানতে পেরেছেন যে, কুফার ইলমী অবস্থা কী ছিল। সেখানে কিরূপ মর্যাদাশীল এবং বিশিষ্ট লোকদের বসবাস ছিল। তাদের হাদীস শাস্ত্রের চর্চা ও ব্যস্ততার কী অবস্থা ছিল। এটাই সেই কারণ যা ইমাম বুখারীকে বারংবার কুফা ভ্রমণে টেনে এনেছে এবং এর ফলে তিনি সেখানকার মুহাদ্দিসীন থেকে যথাসাধ্য উপকৃত হয়েছেন।

বুখারী শরীফে কুফাবাসী রাবী

আমি অনুসন্ধান করে হতবাক হয়েছি যে, বুখারী শরীফে যত রাবী আছেন তার মধ্যে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক হলেন কুফাবাসী। আমি বুখারী শরীফে কুফার রাবীদের সংখ্যা গণনা করে দেখি, তারা তিনশতেরও অধিক। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা না থাকলে তাদের নামগুলো পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরতাম। তবে এতটুকু অসমীচীন হবে বলে মনে হয় না যে, কুফায় স্থায়ীভাবে আবাস স্থাপনকারী যে সব সাহাবী থেকে বুখারী শরীফে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যদি তাদের নামগুলো এখানে তুলে ধরি। স্মর্তব্য, আল্লামা ইবনে হাজার রহ. তার ফাতহুল বারীর ভূমিকায় আরবী হরফের বিন্যাস অনুযায়ী ঐ সব সাহাবীর সকলের নামই উল্লেখ করেছেন, হযরত ইমাম বুখারী রহ. সনদসূত্রে যাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বুখারী শরীফের কুফাবাসী সাহাবীগণ

১. আশআছ বিন কায়েস আল কিন্দী ২. আদী বিন হাতেম ৩. উহবান বিন আউস আসলামী ৪. উকবা বিন আমর ৫. বুরাইদা বিন হাসীব ৬. আলী বিন আবি তালিব ৭. জাবের বিন সামুরা ৮. ইমরান বিন হুসাইন ৯. জারীর বিন আব্দুল্লাহ ১০. আমর বিন হারিছ ১১. জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ ১২. মিরদাস বিন মালেক ১৩. হারেছা বিন ওয়াহাব ১৪. মুসায়্যিব বিন হুযন। ১৫. হুযায়ফা বিন ইয়ামান ১৬. মান বিন শু'বা ১৭. খাব্বাব ইবনুল

আরিত ১৮. মুগীরা বিন শু'বা ১৯. যায়েদ বিন আরকাম ২০. নুমান বিন বাশীর ২১. সুলাইমান বিন মারব ২২. নুমান বিন মুকরিন ২৩. সামুরা বিন জুনাদা ২৪. নুফাই বিন হারেছ ২৫. সানীন আবু জামিলা ২৬. ওয়াহাব বিন আব্দুল্লাহ ২৭. আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা ২৮. আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ এবং ২৯. আব্দুর রহমান বিন আবযা রাদিআল্লাহ তাআলা আনহুম আজমায়ীন। এগুলো হচ্ছে ঐ সব কুফাবাসী মর্যাদাবান সাহাবীর নাম, ইমাম বুখারী রহ. সনদসূত্রে যাদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাণী রেওয়ায়েত করেছেন।

বুখারী শরীফে কুফী সনদ

সম্মানিত পাঠক! আমাদের বিস্ময়াবিষ্টতা আরও বৃদ্ধি পায় যখন আমরা বুখারী শরীফের সনদসমূহ নিয়ে গবেষণা করি। কেননা, তখন আমরা দেখতে পাই, বুখারী শরীফে পঁচিশটি এমন সনদসূত্র আছে যেগুলোর এক এক করে সমস্ত রাবীই হলেন কুফার অধিবাসী। পাঠকবর্গের আত্মিক প্রশান্তির জন্যে এখানে কিছু সনদসূত্র উল্লেখ করছি।

১. বুখারী শরীফের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন–

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيد الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قال حـــدثنا ابو بردة عن ابي عن ابي موسى ...

এ সনদে পাঁচজন রাবীর নাম আছে। যথা ১. সায়ীদ বিন ইয়াহইয়া ২. ইয়াহইয়া সায়ীদ ৩. আবু বুরদা বিন আব্দুল্লাহ (আসল নাম বুরাইদ) ৪. আবু বুরদা বিন আবু মুসা আশআরী (আসল নাম আমের) ৫. আবু মুসা আশআরী (রা.) এই পাঁচজনের সকলেই ছিলেন কুফার অধিবাসী। আল্লামা আইনী রহ. এই সনদের ব্যাপারে বলেন– اسناده كلهم كوفيـــون অর্থাৎ এই সনদের প্রত্যেকে হলেন কুফার বাসিন্দা।

২. ষোল পৃষ্ঠায় এই সনদটিও দেখুন–

حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائـــل قال كان عبد الله الحديث ...

এখানেও রাবী আছেন পাঁচজন। যথা ১. উসমান বিন আবি শাইবা ২. জারীর বিন আবদুল হামিদ ৩. মানসূর বিন মু'তামার ৪. আবু ওয়ায়েল শাকীক বিন সালামা এবং ৫. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)। আল্লামা আইনি রহ. এদের ব্যাপারে বলেন এরা সবাই কুফাবাসী।

আঠার পৃষ্ঠায় দেখুন-

حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ...

এই সনদেও রাবী আছেন পাঁচ জন। ১. মুহাম্মাদ বিন আলা, ২. হাম্মাদ বিন উসামা ৩. বুরাইদা বিন আবদিল্লাহ ৪. আবু বুরদা আমের বিন আবু মুসা (কুফার বিচারক ছিলেন) এবং ৫. আবু মুসা আশআরী (রা.)। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এদের সকলেই ছিলেন কূফী।

৪। উনিশ পৃষ্ঠায় এই সনদটি দেখুন-

حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عـــن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المملـــوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدى إلى سيده الذي فرض عليـــه مـــن الطاعـــة والنصيحة له أجران صحيح.

এই সনদে হুবহু পূর্বোক্ত সনদেরই পাঁচজন রয়েছেন।

৫। তেইশ পৃষ্ঠার এই সনদটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন–

حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصورعن ابي وائل عن ابي موسى

এই সনদেও রাবী আছেন পাঁচজন। ১. উসমান বিন আবি শায়বা ২. জারীর বিন আবদুল হামীদ ৩. মানসুর বিন মুতামার ৪. আবু ওয়ায়েল শাকীক বিন সালালা এবং ৫. আবু মুসা আশআরী (রা.)। আল্লামা আইনী বলেন, এরা সকলে কুফার অধিবাসী।

৬। সাতাশ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করুন-

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره لكن عبد الرحمن بن الاسود عن ا بيه انه سمع عبد الله يقول

এই সনদে রাবী আছেন ছয়জন। ১. আবু নুয়াইম ফাদল বিন দুকাইন (আবু হানিফার ছাত্র)। ২. যুহাইর বিন মুআবিয়া ৩. আবু ইসহাক আমর বিন আব্দুল্লাহ আস সারীয়ী ৪. আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ ৫. আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ এবং ৬. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)। আল্লামা আইনী রহ. বলেন- رواته كلهم ثقات كوفين এই সনদের প্রত্যেক রাবী বিশ্বস্ত এবং কূফী।

৭। বত্রিশ পৃষ্ঠায় এই সনদটিতে নজর দিন-

حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة ابي موسى..

এই সনদে হুবহু চার নং সনদে উল্লিখিত পাঁচজন রাবীর নামই এসেছে। এদের সকলে কূফাবাসী।

৮। তেত্রিশ পৃষ্ঠায় এই সনদের ওপরও দৃষ্টি বুলিয়ে নিন-

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن ابيه

এই সনদে মোট পাঁচজন রাবী আছেন। ১. আবু নুআইম (আবু হানিফার ছাত্র) ২. যাকারিয়া বিন আবু যায়েদা ৩. আমের বিন শারাহীল আশ শাবী ৪. উরউয়া বিন মুগীরা এবং ৫. মুগীরা বিন শুবা (রা.)। আল্লামা আইনী লিখেন- رواته كلهم كوفيون অর্থাৎ এই সনদের সকলেই কূফী।

৯। ৫৬ নং পৃষ্ঠার এই সনদটি দেখুন-

حدثنا اسحاق بن نصر قال نا ابو اسامة عن الاعمش عـن مسـلم عـن مسروق عن المغيرة بن شيبة

এই সনদে ছয়জন রাবী আছেন। ১. ইসহাক বিন ইবরাহীম ২. আবু উসামা হাম্মাদ বিন উসামা ৩. সুলাইমান বিন মিহরান আল আমাশ ৪. মুসলিম বিন সুবাইহ্ ৫. মাসুরুক বিন আজদা এবং ৬. মুগীরা বিন শুবা (রা.)। আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

رجال اسناده كلهم كوفيون

অর্থ: এই সনদের সকল রাবী কুফা নগরীর।

১০। আটান্ন পৃষ্ঠার এই সনদটির প্রতি আলোকপাত করুন-

...حدثنا عثمان قال جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله

এই সনদের রাবী সংখ্যাও ছয়। ১. উসমান বিন আবি শায়বা ২. জারীর বিন আবদুল হামিদ। ৩. মানসুর বিন মু'তামার ৪. ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ আন নাখয়ী ৫. আলকামাহ বিন কায়েস এবং ৬. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)। আল্লামা আইনী রহ. এ সনদ সম্পর্কে বলেন-

رواته كلهم كوفيون و أئمة اجلاء و اسناده من اصح الاسانيد

অর্থ: সনদটির সকল রাবী কুফা শহরের এবং মহান ইমাম বলে গণ্য। আর এ সনদ-সূত্রটি বিশুদ্ধতম সনদসমূহের অন্যতম।

১১। ৯০ পৃষ্ঠায় আছে দেখুন-

حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة ابي موسى...

পূর্বোক্ত চার ও সাত নং সনদের রাবীগণই হলেন এই সনদের রাবী-

১২। একানব্বই পৃষ্ঠায় এই সনদটিও দেখে নিন-

حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعـمـش عن ابراهيم قال الاسود

এই সনদের রাবী আছেন পাঁচজন। ১. উমর বিন হাফস ২. হাফস বিন গিয়াছ (ইমাম আবু হানিফার ছাত্র) ৩. সুলাইমান বিন মিহরান আল আ'মাশ ৪. ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ আন -নাখয়ী ৫. আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ আন নাখয়ী রহ.। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ সনদের রাবীগণও কুফার অধিবাসী।

বেশি দীর্ঘ হয়ে যাবে আশংকায় আর কোন সনদ উল্লেখ করা হলো না। আমি উদাহরণস্বরূপ বুখারী শরীফ থেকে গুটিকয়েক সনদ এখানে উল্লেখ করলাম। অন্যথায় এ কিতাব থেকে কুফাবাসী রাবীগণের ভুরি ভুরি সনদসূত্র উল্লেখ করা যাবে। এমনকি বুখারী শরীফের সর্বশেষ সনদসূত্রের শেষোক্ত রাবী ব্যতীত বাকি সকলেই কুফার অধিবাসী। দেখুন সনদটি-

حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمـارة بـن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال...

এই সনদে রাবী আছেন পাঁচজন। ১. আহমাদ বিন ইশকাব ২. মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল ৩. আম্মারা বিন কা'কা ৪. আবু যারআ এবং ৫. আবু হুরাইরা (রা.)। এদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ব্যতীত বাকি সকলে কুফা নগরীর।

ইমাম বুখারীর উস্তাদবৃন্দ

হযরত ইমাম বুখারী রহ. যে সকল শায়খ ও উস্তাদ থেকে বুখারী শরীফে সরাসরি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন তারা সংখ্যায় প্রায় তিনশত দশজন। তাদের মধ্যে পৌনে দু'শ জনের মত ইরাকী। ইরাকী রাবীদের মধ্যেও আবার পঁয়তাল্লিশজন হলেন কুফার অধিবাসী। আর পঁচাশিজন বসরার। অবশিষ্ট যারা রইলেন তারা অন্যান্য শহরের।

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন! ইমাম বুখারী রহ.-এর সনদসূত্র এবং তাঁর শায়েখ ও উস্তাদবৃন্দের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি আর অপ্রমাণিত থাকে না যে ইমাম বুখারীর নিকট কুফার মুহাদ্দিসগণের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া তিনি তাঁদেরকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করতেন। এ কারণেই তিনি অসংখ্যবার কুফা সফর করেছেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হয়ে তাদের রেওয়ায়েত দ্বারা নিজের বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাবকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন।

কুফা এবং কুফার মুহাদ্দিসগণের ব্যাপারে লা-মাযহাবীদের মতামত

ইমাম বুখারী রহ.-এর উল্লিখিত কর্মপদ্ধতির বিপরীতে যখন আমরা আহলে হাদীস ভাইদের চিন্তা ও কার্যধারার প্রতি লক্ষ্য করি, তখন কিছুতেই বুঝে আসে না যে তারা কিসের ভিত্তিতে ইমাম বুখারীর সাথে নিজেদেরকে এমন ঘনিষ্ঠ প্রমাণ করতে চান। কেননা, হযরত ইমাম বুখারী রহ. কুফা এবং মুহাদ্দিসীনে কুফা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, আহলে হাদীস ভাইদের দৃষ্টিভঙ্গি তার সম্পূর্ণ উল্টো এবং উদ্ভট ধরনের। তারা কুফা এবং কুফার মুহাদ্দিসদের ব্যাপারে এতটাই ঘৃণা এবং বিদ্বেষভাব পোষণ করেন যে, আল্লাহর পানাহ– তাদের বিশ্বাস– কুফাই হলো সকল ফিতনা-ফাসাদের সূতিকাগার। তাদের ধারণা, হাদীসচর্চার প্রশ্নে কুফা ছিল এক ধু-ধু মরুপ্রান্তর। 'রায়' এবং কিয়াসের গর্হিত অনুশীলন ব্যতীত সেখানে আর কিছুই ছিল না। ওখানকার মুহাদ্দিসগণের

নিকট কিছু হাদীস থেকে থাকলেও তা ছিল 'বেনূর' অনির্ভরযোগ্য এবং সনদসূত্ররূপে উল্লেখ করার অনুপযুক্ত। এই প্রসঙ্গে কতিপয় নামকরা আহলে হাদীস আলেমের মতামত পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরছি।

আহলে হাদীস তথা লা-মাযহাবীদের একজন নামজাদা আলেম এবং তার্কিক ইয়াহইয়া গোন্দালবী সাহেব লিখেছেন–

কূফানগরী গড়ে ওঠার সূচনাকাল থেকেই সেখানে অসংখ্য ফিৎনা শিকড় গেড়ে বসেছিল। বরং বলা যায় সর্বপ্রকার ফিৎনা-ফাসাদের সম্পর্ক রয়েছে কূফা কিংবা ইরাকের সাথে। ইসলাম ধর্মে রায় এবং কিয়াসের অনুপ্রবিষ্ট হওয়াটাও ছিল এক বিরাট ফিৎনা। ফলে এ রায় নিজেও আপন কেন্দ্ররূপে কূফাকেই চয়ন করে। ইসলাম ধর্মে কিয়াসের অনুপ্রবেশ ঘটার পর ইরাকের কতিপয় আলেম তার পৃষ্ঠপোষকতায় উঠে পড়ে লাগেন। তারা অতিমাত্রায় রায় এবং কিয়াসের প্রয়োগ ঘটাতে থাকেন। আর এর কারণ হলো তাদের হাদীস এবং আছার (সাহাবীদের বাণী) বিষয়ক জ্ঞান ছিল শূন্যের কোঠায়। এছাড়া সেখানকার পরিবেশ এবং প্রতিবেশেরও এমন একটা প্রভাব ছিল যে তা জনসাধারণকে সাহাবায়ে কেরামের সরল ও সঠিক জীবনপদ্ধতি ছেড়ে কিয়াস এবং রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে। (দাস্তানে হানাফিয়া-পৃ.২১)

উক্ত আলেম অন্যত্র লিখেছেন- শুনে রাখুন! কূফা সব সময়ই বিদআত এবং ধর্মের নবআবিষ্কৃত বিষয়ের আখড়া বিবেচিত হয়ে এসেছে, ইসলামের অনিষ্ট সাধনকারী প্রত্যেক ফিরকা এ শহরেই নিজের আবাস ও ঠিকানা বানিয়েছে। ইসলাম ধর্মে যত প্রকার বিদআতের প্রচলন ঘটেছে তার সবগুলোর জন্মধাত্রী হওয়ার মর্যাদা একমাত্র কূফাই লাভ করেছে। মিথ্যা ও জালহাদীস রচনার সিলসিলাও জারি হয় এই ইরাক এবং কূফা থেকেই। মু'তাযিলা, মুরজিআ এবং রায় ও কিয়াসের ন্যায় যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের উন্মেষ ঘটেছে এখান থেকেই। আর এ কারণেই হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ এ ধরনের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে হাদীস শরীফের জালিয়াতি না করে থাকাটা এদের ধাতে সয় না। এ জন্যে হাদীস রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে তারা গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সঠিক যে কূফায় কতিপয় জ্ঞানসাধক এমন ছিলেন যারা 'রায়' ও কিয়াস বর্জন করে আছার ও হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন। মতাদর্শে

তারা ছিলেন মুহাদ্দিসগণের সাথে সম্পূর্ণ একমত। কূফায় বসবাস করা সত্ত্বেও কূফাবাসীদের মত ও পথকে তারা ঘৃণা করতেন। (খায়রুল বারাহীন- পৃ:২৪)

সম্মানিত পাঠক! কূফার ইলমী অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পেশকৃত বর্ণনাসমূহ যদি একটু স্মৃতির আয়নায় তুলে আনেন, তাহলে দেখবেন গোন্দালভী সাহেবের অজ্ঞতা ও ঠুনকোপনা আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোন গভীর অনুসন্ধানে না গিয়ে তার নিকট আমাদের একটিই জিজ্ঞাসা– কূফা যেহেতু তার সূচনাকাল থেকেই ফিৎনা-ফাসাদের আখড়া বিবেচিত হয়ে এসেছে, সেখানে রায় এবং কিয়াসের চর্চা ছাড়া আর কিছু ছিল না এবং আছার ও হাদীসের অপ্রতুলতা ছিল শোচনীয় পর্যায়ের, সেখানকার অধিবাসীরা সাহাবায়ে কেরামের সরল-সঠিক পথ ছেড়ে রায় ও কিয়াসের পন্থাই অবলম্বন করেছিল, কূফা যেহেতু বিদআত এবং অপচর্চার কেন্দ্রভূমি হিসেবেই পরিগণিত হয়ে এসেছে, সকল বিদআতের জন্মদাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য একমাত্র কূফাই অর্জন করেছে আর এখানকার লোকদের রেওয়ায়াতগুলোকে যেহেতু মুহাদ্দিসগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সেগুলোকে অনির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন, তাহলে ইমাম বুখারী রহ. সেখানে অসংখ্যবার কী আনতে গিয়েছিলেন, আর সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বহু সাহাবী এবং দু একজন না বরং দুই তিন শতেরও অধিক মুহাদ্দিসের বর্ণনাকৃত হাদীস বুখারী শরীফে কেন উল্লেখ করেছিলেন? এর উত্তর এছাড়া আর কীই বা হতে পারে যে গোন্দালবী সাহেব যা কিছু বলেছেন তার সবগুলো ডাহা মিথ্যা, ভুল, অপবাদ ও সত্যের অপলাপ। অথবা ইমাম বুখারী রহ. এসব কিছু- জানা থাকা সত্ত্বেও কূফার মুহাদ্দিসগণের রেওয়ায়েতসমূহ নিজের বুখারী শরীফে উল্লেখ করে মস্ত বড় ভুল করেছেন। নাউযুবিল্লাহ! এছাড়া আর কোন জবাব থাকলে তা গোন্দালবীর কাছেই প্রার্থনীয়।

লা-মাযহাবীদের একজন মস্ত বড় আলেম জনাব মিয়া নজির হুসাইন দেহলবীর ছাত্র মাওলানা আবদুস সালাম বাস্তবী ইলমেফিকৃহকে দুই ভাগে বিভক্ত করার পর লিখেছেন "ইরাকী আলেম সমাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের আছারের পরিমাণ ছিল একেবারেই কম। আর এ বিষয় দু'টিতে তাদের আগ্রহ ও

আকর্ষণও ছিল তথৈবচ। এ কারণে, তাদের দেয়া মাসআলা মাসায়েলের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিয়াসকেই নির্ধারণ করা হত। তাদের মনের ঝোঁক, ধ্যান ও চর্চা হাদীস ও আছারের তত্ত্বানুসন্ধান ছেড়ে ধাবিত হত রায় এবং কিয়াসের দিকে। আর এ কারণেই তারা 'আহলে রায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। (সিরাতুল বুখারী ৩০৪)

মাওলানা তো আজ দুনিয়ায় নেই, তাই তার অনুসারীবর্গের কাছেই আমার প্রশ্ন-যদি ইরাকে হাদীস ও আছারের এমনই টানাপোড়েন ছিল, যদি তাদের ধ্যান ও চর্চা ছিল একমাত্র কিয়াস ও রায় কেন্দ্রিক, তাহলে ইমাম বুখারী রহ. বারবার ইরাক কী উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন? প্রায় দুইশত ইরাকী মাশায়েখের যে রেওয়ায়েতগুলো তিনি গ্রহণ করেছেন, সেগুলোও কি কিয়াস এবং রায় বলেই বিবেচিত হবে? আর কূফার তিন শতাধিক মুহাদ্দিস থেকে তিনি যে হাদীসগুলো বুখারী শরীফে উল্লেখ করলেন সেগুলোই বা এলো কোত্থেকে? এগুলোও কি আপনাদের দৃষ্টিতে রায় এবং কিয়াস বলেই গণ্য হবে?

তাদের আরেকজন আলেম হাক্বীকাতুল ফিক্বহ এর লেখক- মাওলানা ইউসুফ জয়পুরী, যিনি স্বীয় গ্রন্থে হানাফী মাজহাব এবং তার অনুসারীবর্গের বিরুদ্ধে প্রাণ খুলে নিজের হিংসাত্মক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, আর বিবেকের মাথা খেয়ে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন, সেই জয়পুরী সাহেব কূফাবাসীর হাদীসের জ্ঞান নামে শিরোনাম উল্লেখ করে তার অধীনে কতিপয় মুহাদ্দিসের উক্তি উল্লেখ করে যে ফলাফল বের করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন তা হলো– "কূফাবাসীদের হাদীসসমূহ সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য, তাতে কোন নূর নেই। সেগুলো দেয়াল লক্ষ্য করে ছুড়ে ফেলার উপযুক্ত। জয়পুরী সাহেব তো আজ আর বেঁচে নেই। তাই যারা তার নাম নিতে গর্ববোধ করেন আমি তাদেরকেই বলব কূফাবাসীদিগের বর্ণিত হাদীসসমূহ বাস্তবেই যদি এমন হয়, যেমনটি জয়পুরী সাহেব বলেছেন তাহলে ইমাম বুখারী রহ. কূফা কেন গেলেন এবং তাদের হাদীসসমূহের প্রতি এতটা আস্থাই বা পোষণ করলেন কেন? উপরন্তু, তিনি যে তিনশতাধিক কূফী রাবীদের বর্ণিত হাদীস বুখারী শরীফের মত অমর গ্রন্থে ঠাঁই দিলেন, এটাই বা কী উদ্দেশ্যে? লা-মাযাহাবীদের আরেকজন আলেম হাকিম আশরাফ সিন্ধু সাহেব লিখেছেন– রঈসুল মুহাদ্দিসীন ইমাম তিরমিযী রহ.-এর চূড়ান্ত এবং অকাট্য সিদ্ধান্ত শুনে নিন–

لولا جابر الجعفي فكان أهل الكوفة بغير حديث و لولا حماد لكان اهل الكوفة بغير فقه

অর্থাৎ- যদি মিথ্যুক জাবের আলজু'ফী না থাকত তাহলে হানাফীরা হত হাদীসশূন্য। আর যদি হযরত হাম্মাদের আবির্ভাব না ঘটত তাহলে হানাফী মাজহাবে ফিকহের ছিটে-ফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যেত না। জাবের আলজুফীকে ইমাম আবু হানিফা সবচেয়ে বড় কাজ্জাব আখ্যা দিয়েছেন। আর হযরত হাম্মাদও সমালোচনার উর্ধ্বে নন অর্থাৎ তিনি অনির্ভরযোগ্য। (নাতায়েজে তাক্বলীদ- পৃ.৯০)

দেখুন, এই হলো অবস্থা নামধারী লা-মাযহাবী আলেমদের। এখন না ভেবে পারি না যে বেচারা এ দলটি যখন হানাফী মাজহাবরে বিরুদ্ধে মুখ খোলার সুযোগ পায়, তখন বিবেক ও বিবেচনার প্রশ্নেও তারা রিক্তহস্ত হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই হাকিম সাহেব উল্লিখিত লেখায় যে গালগল্পের অবতারণা করেছেন তা বিবেক বুদ্ধির সীমাবহির্ভূত অসংলগ্ন কথা-বার্তায় পরিণত হয়েছে। উপরন্তু তিনি যে ফলাফলটি বের করেছেন তা আরও অধিক গান্দা। হাকিম সাহেবের এটুকুও জানা নেই যে যাকে তিনি ইমাম তিরমিযীর চূড়ান্ত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত বলে পেশ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে ইমাম তিরমিযীর উক্তিই নয়। তা হচ্ছে ইমাম ওয়াকী রহ.-এর কথা। যা ইমাম তিরমিযী স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর তার সূচনা হলো এভাবে–

قال ابو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي...

অর্থঃ আবু ঈসা অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, যদি জাবের আলজু'ফী না থাকত...। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, আহলে কূফা তথা কূফাবাসী বলে তিনি হানাফী মাজহাব অনুসরণকারীদের বোঝাতে চেয়েছেন। বিষয়টি যদিও উম্মতের শ্রেষ্ঠ আলেমদের মতের বিপরীত (তুহফাতুল আহওয়াযীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য) তা সত্ত্বেও আমরা যদি হাকীম সাহেবের কথাটিকে সঠিক ধরে নেই তখন প্রশ্ন হয়, তাহলে হযরত ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে কূফার তিন শতাধিক রাবী থেকে যে রেওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করেছেন আপনার কথামত সেগুলোর ভিত্তিও তো জাবের জুফীকে ধরতে হচ্ছে, এর জবাব কী? তাই বলব বাস্তবেই কূফাবাসী যদি হাদীস শাস্ত্রে এমন কপর্দকশূন্য হয়ে থাকেন

তাহলে ইমাম বুখারীর কী হয়েছিল যে তিনি কূফায় যাতায়াত অব্যাহত রাখলেন এবং স্বীয় গ্রন্থকে তাদের বর্ণনা দ্বারা ঢেলে সাজালেন?

সম্মানিত পাঠক! আলোচনা অনেকটা দীর্ঘ হয়ে গেল। হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী রহ.-এর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের আলোচনা চলছিলো। আমরা জেনেছি যে তিনি শাম, ইরান, ইরাক, মিশর, জাজীরা প্রভৃতি ইসলামী দেশগুলো ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসীনে কেরাম থেকে হাদীস শরিফের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

ইলম অর্জনের পথে দুঃখ কষ্ট

হযরত ইমাম বুখারী রহ. ছাত্রজীবনে যারপরনাই দুঃখ কষ্টের মুখোমুখী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে সব দুঃখ কষ্টকে নীরবে সহ্য করে গেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবু হাতেম বলেন, আমি নিজে ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে "হাদীস অর্জনের জন্যে আমি আদম বিন আবু ইয়াসেরের নিকট উপস্থিত হলাম। সেখানে বাড়ি থেকে টাকা পৌছতে দেরী হয়ে গেল। শেষে আমি ঘাস খেয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কাউকে কিছু জানাইনি। আমার এ দুর্দশার তৃতীয় দিনে একজন অচেনা মানুষ আমার নিকট এসে আমাকে স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে প্রদান করল এবং বলল– এগুলো আপনি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করবেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৪৪৮/১২)

উমর বিন হাফস আল-আশকার বলেন, ইমাম বুখারীসহ আমরা কতিপয় সহপাঠী বসরায় হাদীস লিখতাম। ঐ সময়েরই একটি ঘটনা। ইমাম বুখারী রহ. বেশ কয়েকদিন দরসে উপস্থিত হলেন না। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম টাকা-পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি পরিধানের বস্ত্র বিক্রি করে গৃহে বিবস্ত্র দিন কাটাচ্ছেন। ফলে আমরা চাঁদা উঠিয়ে তার বস্ত্রের ব্যবস্থা করি এবং তা পরিধান করে তিনি দরসে উপস্থিত হতে আরম্ভ করেন। হযরত ইমাম বুখারী রহ.-এর এই সীমাহীন আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং শ্রম ও দুঃখ যাতনার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে ইলমের এমনই প্রাচুর্য দান করেছেন যে তিনি সমসাময়িক সকল আলেমের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন এবং অসংখ্য বর্ষীয়ান ও যুগের খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরাম তার মর্যাদা ও বিশেষত্বের স্বীকৃতি প্রদান করতে থাকেন। তাঁর সম্মানিত উস্তাদ ইমাম আবু হাফস কাবীর হানাফী রহ. তার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে–

هذا شاب كيس، ارجو ان يكون له صيت و ذكر

অর্থাৎ এ যুবকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি আশাবাদী, তার প্রসিদ্ধি হবে জগতজোড়া এবং তার আলোচনা থাকবে মানুষের মুখে মুখে। কালে উস্তাদের কথা ফলেছে। এ কারণে তার সুনাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি যেখানেই যেতেন পুরো শহর তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে আসত।

আত্মসম্মানবোধ:

ইমাম বুখারী রহ.-এর পবিত্র জীবনচরিতে কতিপয় এমন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে যা খুব কম মহামানবের জীবনেই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং তার স্বভাবে আত্মসম্মানবোধ দৃঢ়তা ও অকৃত্রিমতার উপস্থিতি ছিল তীব্র মাত্রায়। তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও ইলমের মর্যাদার ওপর একটি আঁচড়ও পড়তে দিতেন না। ইলমের সম্মানহানিকর সামান্য বিষয়ও তিনি বরদাশ্‌ত করতেন না। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বকীয়তা রক্ষার একটি প্রসিদ্ধ ও শিক্ষণীয় ঘটনা আছে। ছাত্র জীবনে একবার তাঁর নৌভ্রমণের প্রয়োজন পড়ে। এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে তিনি জাহাজে আরোহণ করেন। একজন ভ্রমণসঙ্গীও পেয়ে যান তিনি। সঙ্গীটি বেশ কৌশলে ইমাম বুখারীর মনে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর আসন গেড়ে নিতে সমর্থ হয়। এ কারণে তিনি নিজের স্বর্ণমুদ্রার কথা সঙ্গীটিকে জানিয়ে দেন। একদিন সকালে সঙ্গীটি ঘুম থেকে জেগে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়। অনেক পীড়াপীড়ি ও লোকজনের জিজ্ঞাসাবাদের পর সে বলে আমার এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হারিয়ে গেছে। তার অস্বাভাবিক পেরেশানী দেখে জাহাজের সকল সদস্যকে তল্লাশী করা শুরু হলো। ইমাম বুখারী রহ. বিষয়টা দেখে মুদ্রার থলেটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তারও তল্লাশী নেয়া হলো, শেষে যখন কোথাও মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন জাহাজের যাত্রীরা সঙ্গীটিকে যারপরনাই লজ্জিত করে। এরপর যখন সফর শেষ হলো এবং জাহাজ থেকে সকল যাত্রী নেমে গেল তখন সঙ্গীটি ইমাম বুখারী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করল সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো আপনি কী করেছেন? ইমাম বুখারী রহ. বললেন সেগুলো আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি। সে বলল এত বড় অংকের স্বর্ণমুদ্রা জলে গেল, তা আপনি কিভাবে বরদাশত করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্যতার যে

অনন্য সম্পদ প্রিয় জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে লাভ করেছি তা আমি সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে জলাঞ্জলি দিতে পারি না।
(ইযাহুল বুখারী ১/৩৬)

গুনজার 'তারীখে বুখারা' নামক গ্রন্থে আপন সনদে লিখেছেন- বুখারার শাসনকর্তা খালেদ বিন আহমদ যুহালী ইমাম বুখারীর নিকট এই আবেদন লিখে পাঠান যে, হযরত! আপনি আমার দরবারে তাশরীফ এনে বুখারী শরীফ ও তারীখ নামক গ্রন্থটির দরস প্রদান করুন। এতে আমিও গ্রন্থদ্বয়ের পাঠ শ্রবণ করতে পারব। ইমাম বুখারী রহ. শাসনকর্তার দূতকে জানিয়ে দেন যে, আমার দ্বারা ইলমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় মানুষের দ্বারে দ্বারে ইলমের ফেরী করে বেড়ানোও। তুমি শাসনকর্তাকে বলবে যদি তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের পাঠ শ্রবণের প্রয়োজন থাকে, তাহলে আমার মসজিদে বা আমার বাড়িতে এসে শ্রবণ করে নিতে। আমার এ কথা শাসনর্কতার কাছে ভাল না লাগলে আমার হয়ে তাকে বলবে তিনি বলপূর্বক আমার দরস প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে দেন। যাতে কাল কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাদিসের দরস প্রদান না করার ব্যাপারে অজুহাত দেখানোর মত কোন অবলম্বন আমার নিকট থাকে।

সারল্য, অল্পে তুষ্টি, সাধনা ও খোদাভীরুতা

হযরত ইমাম বুখারী রহ. পিতা ইসমাঈলের সূত্রে অঢেল ধন-সম্পদ লাভ করেছিলেন। ইমাম আবু হাফস কাবীর রহ.-এর একথা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি ইসমাঈলের মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তিনি বলেছিলেন-আমার সম্পদে হারাম বা সন্দেহযুক্ত একটি দিরহামও নেই। (হাদয়ুস সারী, ৪৭৯)

হযরত ইমাম বুখারী রহ. মুদারাবার ভিত্তিতে সে সম্পদ বিনিয়োগ করেন। যেন বেচা-কেনার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমত করে যেতে পারেন। ওয়াররাক আলবুখারী রহ. বলেন- একবার ব্যবসার অংশীদার হযরত ইমাম বুখারী রহ.-এর পঁচিশ হাজার দিরহাম আত্মসাৎ করে পালিয়ে যায়। কেউ এসে ইমাম বুখারী রহ.কে বলল, আপনি এখানকার গভর্নরের মাধ্যমে পলাতক অংশীদারের

এলাকার গভর্নরের নিকট পত্র পাঠিয়ে বিষয়টি অবগত করুন। এতে আপনি অনায়াসে ঐ দিরহামগুলো ফেরত পেয়ে যাবেন। তিনি বললেন আজ আমি যদি পত্র মারফত গভর্নরের মাধ্যমে অর্থ উদ্ধার করি তাহলে কাল তিনি আমার ব্যবসা-বাণিজ্যে অযথা হস্তক্ষেপ করার প্রয়াস চালাবেন। আমি দুনিয়ার বিনিময়ে আমার দ্বীনের কোন ক্ষতি সহ্য করতে প্রস্তুত নই। মাঝে এ বিষয়ে অবশ্য একটু চেষ্টা তদবীর চালানো হয়েছিল। কিন্তু শেষে হযরত ইমাম বুখারী রহ. লোকটির সাথে এ মর্মে সন্ধি করেন যে, সে প্রতি মাসে দশহাজার দিরহাম পরিশোধ করবে। কিন্তু ঐ অর্থের পুরোটাই গচ্চা যায়। তিনি তার কিছুই উসূল করতে পারেননি। (হাদয়ূস সারী ৪৭৯)

ওয়াররাক আল-বুখারী আরও বলেন- হযরত ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, আমি নিজে কোন দিন ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করিনি। বরং অন্য কারও মারফতে আমি তা করিয়ে নিতাম। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন- ক্রয়-বিক্রয়ে নানা রকম সত্য-মিথ্যা বলতে হয়। যা অনুচিৎ। তারীখে বুখারা নামক গ্রন্থে গুনজার স্বীয় সনদে আরও বর্ণনা করেন, একবার আবু হাফস কাবীর রহ. হযরত ইমাম বুখারী রহ.-এর নিকট কিছু মাল হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন। বিকাল বেলা কতিপয় ব্যবসায়ী এসে ঐ মাল পাঁচ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করতে চায়। তিনি বলেন আজ রাতটা থাক, তোমরা কাল সকালে এসো। সকালে অপর কয়েকজন ব্যবসায়ী এসে সে মাল দশহাজার দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিতে চায়। তিনি এ বলে তাদের নিকট বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানান যে গতকাল বিকালে আগমনকারী ব্যবসায়ীদের নিকট আমি এ মাল বিক্রি করার নিয়ত করে ফেলেছি। সেই নিয়তকে ভেঙ্গে ফেলতে চাই না। (হাদয়ূস-সারী ৪৭৯)

হযরত ইমাম বুখারী রহ. অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সহজ-সরল এবং দারিদ্রপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর দারিদ্রপূর্ণ জীবন যাপনের নমুনা নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। যা ইউসুফ বিন আবু জর বুখারী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– "একবার হযরত ইমাম বুখারী রহ. অসুস্থ হলে আত্মীয়-স্বজনরা তার চোখের মণি ডাক্তারদেরকে দেখান। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করে বলেন– এই চোখের মণি তো ঐসব সংসারত্যাগী সাধকদের চোখের মণির মত যারা রুটির সাথে তরকারী আহার করেন না। হযরত ইমাম বুখারী রহ. তাদের কথার

সত্যায়ন করে বলেন, আমি চল্লিশ বছর ধরে তরকারী আস্বাদন করিনি। আত্মীয়রা ডাক্তারদের নিকট এ রোগের চিকিৎসা কী জানতে চাইলে, তারা আহারে তরকারী খেতে হবে বলে জানিয়ে দেন। কিন্তু হযরত ইমাম বুখারী রহ. তা খেতে অস্বীকৃতি জানান। হযরত ওলামায়ে কেরাম তাকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলেন ঠিক আছে, তাহলে রুটির সাথে চিনি মিশিয়ে খেয়ে নেব। (হাদয়ূস-সারী ৪৮১)

হযরত ইমাম বুখারী রহ. সারল্য, অল্পেতুষ্টি ও স্বেচ্ছাদৈন্যের জীবনের সাথে আর্থিক লেনদেনগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি যতটা যত্নবান ছিলেন তিনি সেই একই রকম যত্নশীল ছিলেন আখিরাতে ঘটিতব্য পরিচ্ছন্নতার প্রতি। তাকে কেউ কোন কষ্ট দিলে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। আর যদি তিনি জানতে পারতেন, তাঁর কোন কথা বা কাজে কেউ কষ্ট পেয়েছে তাহলে তিনি ক্ষমা করিয়ে নিয়ে তবে ক্ষান্ত হতেন। এ ধরনের বহু ঘটনা তার জীবনে পাওয়া যায়। দু'চারটি ঘটনা পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি। আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ সারেফী বলেন- "আমি একদা হযরত ইমাম বুখারী রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর বাঁদী তাঁর পাশ দিয়ে ঘরের ভেতর যেতে চাইছিল। ঘটনাক্রমে বাঁদীর পায়ের আঘাতে হযরত ইমাম বুখারী রহ. এর পাশে রাখা কালির দোয়াতটি পড়ে যায়। হযরত ইমাম বুখারী রহ. বিরক্ত হয়ে বললেন এ কী চলার ধরন! বাঁদী বলল, কোন দিকে যখন যাতায়াতের পথ অবশিষ্ট নেই তখন আর কী করা যাবে? এতে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) রেগে হস্ত প্রসারিত করে বলেন– যাও চলে যাও, আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম। তার এ কাজের দরুন কেউ তাকে বলল, সে তো আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছে। এতে তাকে আযাদ করে দেয়ার তো কিছু ছিল না। উত্তরে হযরত ইমাম বুখারী রহ. বললেন সে যদিও আমাকে অসন্তুষ্ট করেছিলো, কিন্তু আমি নিজের কর্মের দ্বারা আমাকে খুশি করে নিয়েছি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১২/৪৫২) ওয়াররাক আল-বুখারী বলেন, একদা অন্ধ আবু মাশারকে হযরত ইমাম বুখারী রহ. বলেন, হে আবু মাশার! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। আবু মা'শার পেরেশান এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন- হযরত! ক্ষমা আবার কিসের? ইমাম বুখারী রহ. বললেন- একবার হাদীস বর্ণনাকালে আমার দৃষ্টি তোমার ওপর পড়ে। তুমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে অপূর্ব ভঙ্গিমায় তোমার মাথা ও হাত

দোলাচ্ছিলে। আমি তা দেখে হেসে ফেলি। আবু মা'শার উত্তরে বললেন– হে শ্রদ্ধেয় ইমাম! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া ও রহমত বর্ষণ করুন! আপনাকে অসংখ্যবার ক্ষমা! আপনার সাথে আমার কোন মনোমালিন্য নেই। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৪৪৪)

ওয়াররাক আলবুখারী আরও বলেন– ইমাম বুখারী (রহ.) তীরন্দাজির জন্যে খোলা ময়দানে গমন করতেন। তিনি তীর নিক্ষেপে এতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে, মাত্র দু'বার ব্যতীত আমি কখনও তাকে লক্ষ্যচ্যুত হতে দেখিনি। (সিয়ারুআলানিম নুবালা-১২/৪৪৪)

আরেকদিনের ঘটনা। তীরন্দাজির জন্যে আমরা ফিরাবরের (ইমাম বুখারীর জন্মস্থান) বাইরে গমন করি। তো আমরা শহরের সেই ফটকের দিকে যাত্রা করি যেটি 'ওয়াররাদা' নদীর ডান দিকে পৌঁছে দেয়। শেষে তীরন্দাজি শুরু হলো। ঘটনাক্রমে ইমাম বুখারীর তীরটি সেতুর একটি কিলকে গিয়ে বিদ্ধ হয়। তাতে কিলকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি এ দৃশ্য দেখে সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন এবং কিলকে বিদ্ধ তীরটি তুলে আনলেন। তারপর তীরন্দাজি বন্ধ করে বললেন চলো, সবাই ফিরে যাই। সুতরাং আমরা সকলে ফিরে এলাম। বাড়ি এসে তিনি বললেন (আবু জাফর) একটি কাজ আছে, করবে? ঐ সময় তার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছিলেন। যাই হোক, আমি আরজ করলাম জী হযরত, আমি প্রস্তুত। এবার তিনি বললেন, সেতুর মালিকের নিকট যাও এবং তাকে বলো আমার তীর দ্বারা আপনার সেতুর কিলক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই আমাকে নতুন একটি কিলক লাগাবার অনুমতি দিন অথবা আমার কাছ থেকে তার মূল্য নিয়ে নিন। যাতে আমার দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে, তার একটা প্রতিবিধান হয়ে যায়। সেতুর মালিক হুমাইদ ইবনুল আখদারকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে সম্মানিত ইমামকে সালাম জানাবে এবং বলবে শুধু ক্ষমাই নয় বরং আমার যাবতীয় ধন-সম্পদ আপনার জন্যে উৎসর্গিত। আবু জাফর বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে সেতুর মালিকের এ সংবাদ শোনাতেই তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ পাঁচশত হাদীস শুনিয়ে দেন। এর পরক্ষণেই আবার ফকীর-মিসকীনদের মাঝে তিনশত দিরহাম বণ্টন করেন। (সিয়ারু আঃ ১২/ ৪৪৩)

গীবত থেকে বেঁচে থাকা

মুহাম্মাদ বিন আবু হাতেম ওয়ারারাক আল-বুখারী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)কে বলতে শুনেছি যে,

ما اغتبت احدا منذ علمت ان الغيبة حرام

অর্থাৎ যে দিন থেকে জেনেছি যে গীবত হারাম, সেদিন থেকে আমি কারও গীবত করিনি। (হাদয়ুস সারীঃ ৪৮৯)। বকর বিন মুনির বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে,

اني لارجو ان القي الله ولا يحاسبني اني اغتبت احدا

অর্থাৎ আমি আশাবাদী, আল্লাহর সাথে এই অবস্থায় মিলিত হব যে, কারও গীবত করেছি এই হিসাব তিনি আমার কাছ থেকে নিবেন না। (হাঃ সাঃ ৪৮০)

মুহাম্মাদ বিন আবু হাতেম বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, "কেয়ামতের দিন আমার নিকট কেউ কোন হক চাইতে পারবে না। আমি আরজ করলাম, লোকজন আপনার তারীখ নামক গ্রন্থের ওপর আপত্তি করে থাকে যে, তাতে গীবত করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি 'তারীখে' পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের বাণী উদ্ধৃত করেছি। তাতে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলিনি। (হাঃ সাঃ ৪৮০) আল্লামা ইবনে হাজার শাফেয়ী বলেন,

وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد و تحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح و التعديل فان اكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه و نحو هذا و قل ان يقول كذاب او وضاع وانما يقول كذبه فلان رماه فلان يعني بالكذب

অর্থঃ ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের রাবীদের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনের ক্ষেত্রে পরম সতর্কতা ও খোদাভীতির পরিচয় দিয়েছেন। জরাহ-তা'দীল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ সবার নিকটই বিষয়টি স্পষ্ট। এ মর্মে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বলেন, "তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ নীরব থেকেছেন। অমুক রাবীর ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে বা মুহাদ্দিসগণ অমুকের হাদীস গ্রহণ করেননি। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কাউকে মিথ্যুক বা হাদীস

জালকারী বলেছেন। তবে বাস্তবে কোন রাবী মিথ্যুক বা হাদীস জালকারী হলে তার ক্ষেত্রে যা বলেছেন তা হলো, অমুক মুহাদ্দিস অমুক রাবীকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন বা অমুক অমুকের ব্যাপারে মিথ্যা বলার অভিযোগ এনেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ সম্মানিত পাঠক! ইমাম বুখারী (রহ.) এর জীবনের উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি মানুষের হক সংরক্ষণের ব্যাপারে কতটা যত্নশীল ছিলেন। পরকালের হিসাবের চিন্তা তাঁর মধ্যে কী পরিমাণে ছিল। আর তিনি অন্যের ছিদ্রান্বেষণ ও গীবত থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখতেন। তার বিপরীত আমাদের লা-মাযহাবী ভাইদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন– যারা ইমাম বুখারী (রহ.) এর সাথে প্রেম ও ভালবাসার দাবীদার– তাদের যা অবস্থা তা কারও কাছে গোপন নেই। এদের ভেতরে উম্মতের ফক্বীহ এবং সূফী-সাধকদের ব্যাপারে এই পরিমাণ হিংসা-বিদ্বেষ পূর্ণ হয়ে আছে যে, তা বলে শেষ করা যাবে না। নমুনা স্বরূপ কিছু দেখতে চাইলে ফক্বীহ ও সূফীগণের বিরুদ্ধে লেখা তাদের বইগুলো পড়ে দেখুন। বাজারে সচরাচর যা পাওয়াও যায়।

ইবাদতের আগ্রহ

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) এর ইবাদত মনস্কতার উদাহরণ হিসেবে এটাই কম কিসে যে, তিনি নিজের প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ এবং অনুকরণেই করতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার নিয়মিত আমল এই ছিল যে, শেষ রাতে তের রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন রমজানুল মুবারকে। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) ইমাম হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে,

كان محمد بن اسماعيل البخاري إذا كان اول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه اصحابه فيصلى بهم و يقرأ في كل ركعة عشرين آية و كذالك إلى ان يختتم القرآن ، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ، و يقول عند كل ختمة دعوة مستجابة

অর্থঃ হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আমল এই ছিল যে, রমজানুল মোবারকের প্রথম রাতে লোকজন তার নিকট একত্রিত হয়ে যেত। তিনি তাদেরকে নিয়ে এভাবে নামাজ পড়াতেন যে, প্রতি রাকাতে বিশটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন। আর এভাবে পুরো রমজান শরীফে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এছাড়া তিনি একা শেষরাতে পুরো কুরআনের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতেন। আর এভাবে প্রতি তিন রাতে সাহরীর সময় এক খতম পুরা করতেন। আবার রমজান মাসে সারাদিন তিলাওয়াতে কাটাতেন এবং প্রতিদিন এক খতম করতেন। তিনি বলতেন, প্রতিটি খতম শেষে একটি করে দোআ কবুল হয়। (হাঃ সাঃ ৪৮১)

জ্ঞাতব্য ঃ সম্মানিত পাঠক! ইমাম হাকেমের উক্ত বর্ণনা দ্বারা আমরা দু'টি বিষয় জানতে পারলাম। এক রমজান মাসে ইমাম বুখারী (রহ.) তারাবী ব্যতীত তাহাজ্জুদের নামাজও আদায় করতেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, ইমাম বুখারী (রহ.) এর মতে তারাবী ও তাহাজ্জুদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তারাবী এবং তাহাজ্জুদ অভিন্ন কিছু নয়। বরং তারাবী এক নামাজ এবং তাজাজ্জুদ আরেক নামাজ। পক্ষান্তরে লা-মাযহাবীগণ ইমাম বুখারীর উক্ত আমলের অন্যথা করেন। তারা অত্যন্ত জোরালোভাবে একথা বলে বেড়ান যে, তারাবী এবং তাহাজ্জুদ ভিন্ন নামাজ নয়। বরং উভয়টি অভিন্ন নামাজ। এ কারণে তাদের শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী লিখেছেন, কেউ কেউ তারাবী এবং তাহাজ্জুদকে ভিন্ন ভিন্ন নামাজ মনে করে থাকে এটা ভুল। এর কোন দলীল হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নামাজ, ৯৮)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান বলেন, এটাই সঠিক যে, তারাবী তাহাজ্জুদ বেতের এবং সালাতুল লাইল সবগুলো অভিন্ন নামাজ। (তাইসীরুল বারী ঃ ২/৭৭)

হাকেম সাদেক সিয়ালকোটী সাহেব লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে তারাবীর নামাজ বেতেরসহ পড়েছেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাহাজ্জুদও পড়েননি এবং বেতের ও পড়েননি। বোঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিয়ামুল লাইলি (তাহাজ্জুদ) রমজান মাসে কিয়ামু রমজানে (তারাবীতে) পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাহাজ্জুদ ও বেতের নামাজ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর আদায় করতেন সেই একই তাহাজ্জুদ ও বেতের রমজান মাসে ঘুমিয়ে পড়ার আগে এশার নামাজের পরে পড়ে নিতেন। (সালাতুর রাসূল ঃ ৩৮০) প্রায় সকল লা-মাযহাবী আলেমদের মাজহাব ও মত এটাই। যা হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) এর মত মাজহাব এবং আমলের বিপরীত।

দুই. অপর যে বিষয়টি আমরা জানতে পারলাম তা হলো, হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) রমজানুল মুবারকে প্রত্যহ দিনের বেলা এক খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মতে তিন দিনের কম সময়ে কোরআন শরীফ খতম করা জায়েজ। ফলে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফে যথারীতি একটি অধ্যায় কায়েম করে এই বিষয়টি প্রমাণও করেছেন। আমাদের কথার সত্যতা যাচাই করতে দেখুন বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৭৫৫ পৃ.।

পক্ষান্তরে লা-মাযহাবীগণ এ মতের কঠোর বিরোধী। তারা বলেন, তিন দিনের কমে কোরআন শরীফ খতম করা মাকরূহ এবং আদব বিরুদ্ধ একটি কাজ। এ মর্মে আল্লামা ওহীদুজ্জামান লিখেছেন "উত্তম হলো, কোরআন বুঝে ধীরে চল্লিশ দিনে খতম করা। সর্বনিম্ন সাত দিনে বা তিন দিনে খতম করা উচিৎ। এর কম সময়ে খতম করাকে আমাদের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের শায়খ মাকরূহ বলেছেন। আর বিষয়টি কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আদবেরও খেলাফ। (তাইসীরুল বারী ৩/১৩১) তিনি অন্যত্র আরও বলেন, "আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নিকট তিন দিনের কমে খতম করা মাকরূহ। (তাইসীরুল বারী ঃ ৬/৫৩৫)

ইতিহাস সাক্ষী, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সারা বছর তাহাজ্জুদে প্রতিদিন এক খতম তিলাওয়াত করতেন। এর ওপর লা-মাযহাবীগণ জবানদরাজির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তারা বলেন, আমলটি হাদীস বিরুদ্ধ এবং বিদআত। কিন্তু হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিরুদ্ধে তারা কিছুই বলেন না। অথচ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আমলে কোন পার্থক্য নেই। এখন লা-মাযহাবীগণই বলতে পারবেন দু'জনের আমলের মধ্যে কী পার্থক্য? আসল কথা হলো,

عين الرضا عن كل عيب كليلة ✪ وعين السخط تبدي المساويا

ইবাদতে আত্মনিমগ্নতা

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) অত্যন্ত খুশু-খুযু এবং ধ্যান ও আত্মনিমগ্নতার সাথে নামাজ আদায় করতেন। তাঁর আত্মসমর্পণ ধ্যানমগ্নতার পরিমাণ কী ছিল, তা অনুমান করা যাবে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে।

"মুহাম্মাদ বিন আবু হাতেম বলেন, একবার হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)কে তার কোন এক শাগরেদের বাগানে তাশরীফ আনতে দরখাস্ত পেশ করা হল। যখন জোহর নামাজের সময় হলো, তখন তিনি সাথীবর্গকে নিয়ে তা আদায় করলেন। ফরজ শেষ করে তিনি নফলের নিয়ত বাধলেন। তাতে অনেক দীর্ঘ ক্বিয়াম করলেন। নামাজ শেষ করে নিজের জামার প্রান্ত উঠিয়ে জনৈক শিষ্যকে বললেন, দেখ তো, আমার জামার ভেতর কিছু আছে কিনা? সে ভেতরে একটি ভিমরুল খুঁজে পেল। যেটা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শরীরের সতেরটি কিংবা আঠারটি স্থানে দংশন করেছে। এ কারণে তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠেছিলো। কেউ আরজ করল, প্রথম দংশনের সময়ই আপনি নামাজ ছেড়ে দিলেন না কেন? তিনি বললেন আমি একটি সূরা শুরু করেছিলাম। ইচ্ছে হলো, তা শেষ করি। (তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪৭)

জ্ঞাতব্য ঃ এতো ছিল হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নামাজের অবস্থা। পক্ষান্তরে আমাদের লা-মাযহাবী ভাইগণ যে নামাজ পড়েন তার বাস্তবচিত্র কী, তার বর্ণনা তাদেরই একজন আলেমের মুখে শুনে নিন। (আমি বললে তো দোষচর্চা হয়ে যাবে।) সুতরাং মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টি বলেন, "যাই হোক, ব্যস্ততার দরুন সেই বেচারাদের তো নামাজ পড়াই কঠিন। এরপরও তাদের অনেক বড় কুরবানী যে, তারা এই বে-পানাহ ব্যস্ততা থেকে কিছুটা সময় বের করে নিয়ে দুই-চার রাকাত নামাজ পড়ে নেয়। এবং সেই নামাজেই তাদের হেলেদুলে ওঠার ও দেহের বিভিন্ন অংশে হাত ফেরাবার খানিকটা অবকাশ মেলে। তখন মনে হয় নামাজে হেলেদুলে ওঠাও যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যার ওপর আমল করা কর্তব্য। (নুকুশে আযমত রাফতাঃ ২৪)

ইমাম বুখারীর মাজহাব

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মাজহাব কী, তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় আলেমের মতে তিনি শাফেয়ী মাজহাব অনুসরণ করতেন। কেউ বলেন, তিনি হাম্বলী ছিলেন। আবু হাশেম আব্বাদী, ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ, নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রমুখ আলেমের মতে তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাজহাবের। আর ইবনে আবি ইয়ালা, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম বলেন, তিনি হাম্বলী মাজহাব অনুসরণ করতেন। পাঠকগণের সামনে উল্লিখিত আলেমদের লিখিত মতামত তুলে ধরছি। যাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা না থাকে। আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.) "তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ" নামক গ্রন্থে ইমাম বুখারীর জীবন চরিত সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থেরই এক স্থানে তিনি লিখেছেন–

ذكر ابو عاصم العبادي ابا عبد الله في كتابه الطبقات و قال سمع مـــن الزعفراني و ابي ثور و الكرابيسي، قلت و تفقه على الحميدي و كلهم من اصحاب الشافعي

অর্থঃ হযরত আবু আসেম আব্বাদী, তিনি ইমাম বুখারীর আলোচনা স্বীয় গ্রন্থ "তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যায়" করেছেন। তিনি বলেন– ইমাম বুখারী (রহ.) যাআফরানী, আবু ছাউর এবং কারাবীসির নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর আমি (আল্লামা সুবকী) বলি, তিনি অর্থাৎ ইমাম বুখারী ইলমে ফিকাহ অর্জন করেছিলেন ইমাম হুমাইদীর কাছ থেকে। তারা সকলেই ছিলেন শাফেঈ মাজহাবের। (তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ, আল-কুবরা ২/২১৪)

এই বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, আবু আসেম আব্বাদী ও তাজুদ্দীন সুবকীর মতে ইমাম বুখারী (রহ.) শাফেঈ মাজহাবের ছিলেন। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) বলেন-

ومن هذا القبيل محمد بن اسماعيل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعية وممن ذكره في الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال انه تفقه بالحميـــدي و الحميدي تفقه بالشافعي ، واستدل شيخنا العلامة على إدخـــال البخـــاري في الشافعية و يذكره في طبقاتهم و كلام النووي الذي ذكرناه شاهدله

অর্থঃ হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)ও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তিনি শাফেঈ আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.) তাকে শাফেঈ মাজহাবের অনুসারী বলেছেন। তিনি বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) ফিকহ শিখেছেন ইমাম হুমাইদীর নিকট। আর হুমাইদী শিখেছেন ইমাম শাফেয়ীর নিকট। আমাদের শায়েখ যে কারণে ইমাম বুখারীকে শাফেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন তা হলো, আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.) তাঁকে "তাবাকাতে শাফেঈয়্যাহ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর আল্লামা নববী (রহ.) -এর যে কথা আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি তা-ও এ মতের বলিষ্ঠ সমর্থক। (আল ইনসাফ মাআ তারজামায়ে ওয়াস্‌সাফ ঃ ৫৭)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ- (রহ.) এর এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার মতে ইমাম বুখারী (রহ.) শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের যুগের মুজাদ্দিদ এবং কালের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁন স্বীয় গ্রন্থে হানাফী ইমামদের আলোচনার পর লিখেছেন–

فالان اذكر نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين جائز الشرفين، وهولاء صنفان احدهما من تشرف بصحبة الإمـــام الشـــافعي، والآخر من تلاهم من الأئمة ، اما الاول فمنهم احمد خالد الخلاء ... واما الصنف الثاني فمنهم محمد بن ادريس ابو حاتم الرازي و محمد بن اسماعيل البخاري

অর্থঃ এখন শাফেয়ী ইমামদেরকে নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। যেন আমার এ কিতাব উভয় দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করে এবং উভয় প্রকারের মর্যাদা অর্জন করে। শাফেয়ী ইমামগণ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকারে রয়েছেন ঐ সকল ইমাম যারা সরাসরি হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারে আছেন ঐ সব ইমাম যারা ইলমে ফিকহে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। উদাহরণত প্রথম প্রকারের একজন হলেন, আহমদ খালেদ আল-খাল্লাল। আর দ্বিতীয় প্রকারের কয়েকজন হলেন, মুহাম্মদ বিন ইদরীস, আবু হাতেম রাজী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহ.)। (আবজাদুল উলূম ঃ ৩/১২৬)

নবাব সাহেবের এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাঁর মতে ইমাম বুখারী (রহ.) শাফেয়ী মাজহাব অনুসরণ করতেন। কেননা তিনি আল্লামা সুবকী এবং তাঁর বরাতে আবু আসেম আব্বাদীর মতামত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাদের মতের বিরোধিতা করেননি। যেমন একস্থানে তিনি লিখেছেন–

قال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته كان البخاري إمام المسلمين و قدوة المؤمنين شيخ الموحدين والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين قال وقد ذكره ابو عاصم في طبقات أصحابنا الشافعية

অর্থ ঃ শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.) তার তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম বুখারী ছিলেন মুসলমানদের সরদার এবং মুমিনগণের ইমাম। তিনি ছিলেন তৌহীদী জনতার আদর্শ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। হযরত আবু আসেম আব্বাদী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)কে শাফেয়ী মাজহাবের গণ্য করেছেন।

(আল-হিত্বা ফি যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহঃ ২৮০)

নবাব সাহেবের উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারাও স্পষ্ট বোঝা যায়, তার মতে ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন শাফেয়ী মাজহাব অবলম্বনকারী। কেননা তিনি আল্লামা সুবকী এবং তার বরাতে আবু আসেম আব্বাদী (রহ.) এর উক্তি উল্লেখ করে নীরব থেকেছেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন নি। ক্বাজী আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়া'লা হাম্বলী (রহ.) স্বীয় কিতাব "তাবাকাতুল হানাবিলায়" ইমাম বুখারী (রহ.)কে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যদ্বারা বোঝা যায়, তার মতে ইমাম বুখারী (রহ.) ছিলেন হাম্বলী মাজহাবের। (তাবাকাতুল হানাবিলাঃ ১/ ২৭১) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) একস্থানে লিখেছেন–

وأئمة الحديث كالبخاري و مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، هـم اتباعهما و ممن يأخذ العلم والفقه عنهما

অর্থঃ আর হাদীসের ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইসহাক

রাহওয়াই– এর অনুসারী। তারা হাদীস এবং ফিকহ অর্জন করেছিলেন এ দু'জন থেকেই। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ২৫/ ২৩২)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন–

وكذالك البخاري ومسلم و ابو داؤد والأثرم، و هذه الطبقــة مــن أصحاب احمد اتبع له من المقلدين المحض المنتسبين اليه

অর্থঃ একই অবস্থা হলো, ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও ইমাম আছরামের। এ ত্ববকাটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মাজহাব মেনে চলতেন, তার মুক্বাল্লিদ ছিলেন এবং তারই দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতেন। (ই'লামুল মুআক্বিয়ীনঃ ২/২২৩)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের লিখিত বক্তব্য দ্বারা জানা গেল, এদের উভয়ের মতে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) হাম্বলী মাজহাব মেনে চলতেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মুকাল্লিদ ছিলেন। এখন কথা হলো, ইমাম বুখারী (রহ.) কে শাফেয়ী মাজহাবের বলুন কিংবা হাম্বলী মাজহাবের উভয় অবস্থায় যা প্রতিপন্ন হয় তা হলো, তিনি একজন মুকাল্লিদ ছিলেন। ছিলেন কোন মাজহাবের অনুসারী। তবে কতিপয় আলেমের বক্তব্য হলো, ইমাম বুখারী ছিলেন মুজতাহিদে মুতলাক তথা কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি মাসায়েল উদ্‌ঘাটনে সমর্থ। আর তাকে যে শাফেয়ী বলা হয় তা কেবল এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তার ইজতিহাদগুলো ইমাম শাফেয়ীর ইজতিহাদের সাথে মিলে যেত। কিন্তু গবেষণায় মতটির গ্রহণযোগ্যতা একেবারে লোপ পেয়ে যায়। কেননা আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন–

ان البخاري في جامع ما يورده من تفسير الغريب انما ينقله عن أهــل ذلك الفن ، كابي عبيده والنضر بن شميل و الفراء وغيرهم امــا المباحــث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي و ابي عبيد وامثالهم ، واما المسائل الكلامية فاكثرها من الكرابيسي وابن كلاب و نحوهما

অর্থঃ ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের বিরল ও দুর্বোধ্য শব্দাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গের ব্যাখ্যার

আলোকে। যথা আবু উবায়দা নজর বিন শুমাইল, ফাররা প্রমুখ। ফিকহী আলোচনায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, আবু উবাইদা প্রমুখ আলেমগণের কাছ থেকে সহায়তা নিয়েছেন। আর ইলমুল কালামের অধিকাংশ মাসআলা তিনি বর্ণনা করেছেন কারাবীসী, ইবনুল কিলাব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ থেকে। (ফাতহুল বারী ২/২৫৩)

আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.)-এর এই কথাগুলো বোঝাচ্ছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ফিক্বহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী এবং আবু উবাইদের ফিকহের সাহায্য নিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন না। কেননা কোন মুজতাহিদে মুতলাক ফিকহী আলোচনায় নিজে ইজতিহাদ করেন, এ বিষয়ে অপর কারও সহায়তা নেন না এবং কারও মতামতও উদ্ধৃত করেন না। প্রণিধানযোগ্য আরেকটি বিষয় হলো, ইমাম বুখারী (রহ.) যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ হতেন, তাহলে তার আলোচনা 'ত্বাবাকাতুল ফুকাহায়' করা হত। কিন্তু 'তাবাকাতুল ফুকাহায়' তার আলোচনা পাওয়া যায় না। ইমাম আবু ইসহাক শিরাজী শাফেয়ী (রহ.) স্বীয় কিতাব 'তাবাকাতুল ফুকাহায়' ইমাম বুখারীকে নিয়ে আলোচনা করেননি। তৃতীয় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের উসূল বা নীতিমালা থাকে। যে নীতিমালার আলোকে তারা ইজতিহাদ করে থাকেন। যদি ইমাম বুখারী (রহ.) মুজতাহিদ হতেন, তাহলে তার ইজতিহাদের নীতিমালাও থাকত। কিন্তু আমরা তার ইজতিহাদের কোন মূলনীতির সন্ধান পাই না। চতুর্থ আরেকটি বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার যে, যদি ইমাম বুখারী (রহ.) স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ হতেন, তাহলে ফিক্বহী গ্রন্থাবলীতে যেখানে অন্যান্য ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয় সেখানে ইমাম বুখারী (রহ.) এরও মতামত উল্লেখ করা উচিৎ ছিল। অথচ ফিকহী গ্রন্থাবলীতে তার ফিকহী মতামতের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইমাম তিরমিযী (রহ.) যিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বিখ্যাত শিষ্যবৃন্দের একজন, তিনিও ইমাম বুখারী থেকে কেবল কোন হাদীস সহিহ হওয়া বা যয়ীফ হওয়ার বিষয়টি বা কোন রাবী ছিক্বা হওয়া বা দুর্বল হওয়ার মতামতগুলো উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিরমিযী শরীফের কোথাও তিনি ইমাম বুখারীর কোন বক্তব্যকে ফিকহী মাজহাব হিসেবে উল্লেখ করেননি। যেখানে তিনি আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন

ব্যতীত ইমাম বুখারীর চেয়ে কম মানের অনেকের বক্তব্য ও মাজহাবও উল্লেখ করেছেন। এটিও এ বিষয়ের স্পষ্ট দলীল যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন না। হ্যাঁ, তবে ইমাম বুখারীকে যদি মুজতাহিদে মুনতাসিব বলা হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। কেননা এ ধরনের মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মূলনীতির ক্ষেত্রে স্বীয় ইমামের তাক্বলিদ করে থাকেন। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)। এরা দু'জন মুজতাহিদে মুনতাসিব হওয়ার সাথে সাথে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মুকাল্লিদ তথা মাজহাবের অনুসারীও ছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সরফরায খাঁন সাফদার (রহ.) একস্থানে লিখেছেন- "সারকথা, আমাদের গবেষণামতে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। না তিনি মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন আর না এই অর্থে শাফেয়ী মাজহাবাবলম্বী ছিলেন যে, তার ইজতিহাদসমূহ হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইজতিহাদের সাথে মিলে যেত। বরং তিনি উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততার আলোকে শাফেয়ী মাজহাবের ছিলেন এবং তাও এভাবে যা একজন প্রাজ্ঞ আলেমে দ্বীনের মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ সম্মানিত পাঠক! আপনি হয়ত মহান ও প্রাজ্ঞ আলেমগণের লিখিত বক্তব্য দ্বারা নিশ্চিতভাবে জেনে গেছেন যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) মুকাল্লিদ ছিলেন। ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে স্বীয় ইমামের তাকলীদ করতেন। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) তাক্বলীদের বিরোধিতায় একটি হরফও উচ্চারণ করেছেন বলে প্রমাণ করার সুযোগ নেই। কিন্তু লা-মাযহাবীগণ, যারা ইমাম বুখারীর মুহাব্বতের দাবীদার তারা তাকলীদের এই পরিমাণ বিরোধী এবং তাকলীদের প্রশ্নে এই পরিমাণ উন্নাসিক যে, আল্লাহর পানাহ! তাদের ছোট বড় সকলে ইহুদী-খৃষ্টান জাতির পাদ্রী পুরোহিত ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের ব্যাপারে যে সব কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলোকে মহান ইমামগণ ও তাদের অনুসারীবৃন্দের বিরোধিতায় পাঠ করে এবং প্রয়োগ করে।

তাকলীদের বিরোধিতায় লেখা তাদের অনেক বই পুস্তক আছে। যেগুলোর ধরন এতই নোংরা ও বিপণন সবর্স্ব যে, কোন সুস্থ বিবেকধারী মানুষ তা দেখলেই তার গা শিউরে উঠবে। ঐ সব বই-পুস্তক থেকে কতিপয় উদাহরণ পাঠক সমীপে তুলে ধরছি। যাতে তাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-গবেষণার ধরন সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়।

মাওলানা আবদুল আজীজ মুলতানী লিখেছেন, "দোজাহানের সরদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর চার শতাব্দিকাল ইসলাম তাকলীদের আপদ ও উপদ্রব থেকে পাক-পবিত্র ছিল"। (ইসতিসালুত-তাকলীদঃ ২)

একটু অগ্রসর হয়ে আরও লিখেন, এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, তাকলীদ হলো داء الأمم তথা একটি প্রাচীন দুরারোগ্য ব্যাধি। এটাই পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে নবীগণের আনুগত্য হতে ফিরিয়ে তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। (ইসতিসালুত-তাক্বলীদঃ ২) তিনি আরেকটু সামনে গিয়ে বিদআত ও কুপ্রথার ভ্রান্তি প্রমাণ করার পর লিখেছেন "এ সকল কুপ্রথা যে সব কারণে বিদআত বলে গণ্য, হুবহু সে কারণগুলোই বিদ্যমান রয়েছে তাকলীদী মাজহাবগুলোতে। সুতরাং প্রচলিত কুপ্রথাগুলোকে ঠিকই বিদআত বলব আর তাকলীদের প্রসঙ্গ এলে চোখ বুজে থাকব এর কোন কারণ নেই। যা হলো গিয়ে যাবতীয় অন্যায় ও বিভ্রান্তির জনক এবং উৎসমূল। (প্রাগুক্ত ঃ ৯)

সাপ্তাহিক আল-ইতিসাম পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ লিখেছেন- রয়ে গেল এই কথা যে, তাকলীদ বিদআত এবং গোমরাহি কিনা? তো এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবগতির সাথে বলতে পারি যে, তাকলীদ কোন কোন অবস্থায় শিরক বনে যায়। আর সর্বাবস্থায় তা বিদআত এবং গোমরাহি। (আহলে হাদীস আওর আহলে তাকলীদ ঃ ১২) বশিরুর রহমান গাওহার আফশানী বলেন-"বস্তুত, তাকলীদ যেহেতু মূর্খতা, বিবেকহীনতা, অদূরদর্শিতা, দৃষ্টির স্থূলতা আর সন্দেহ প্রবণতা বলে সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু দ্বীন ও ঈমানের জন্যে তার ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক হওয়াও স্পষ্ট। তাকলীদের উপস্থিতিতে কোন মানুষের পক্ষে পূর্ণতা লাভ করাও সম্ভব নয়। তাকলীদ নামক আপদটি দোজাহানের বঞ্চনা ও ভাগ্য বিড়ম্বনার অপর নাম। (যারবুন শাদীদ আলা আহলিত তাকলীদঃ ৬)

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া গোন্দালবী লিখেছেন- "ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের ওপর সবচেয়ে বড় যে ফিতনাটি চেপে বসেছে, তা এসেছে কুরআন-সুন্নাহ হতে বিমুখতা এবং তাকলীদের বেশে। খায়রুল কুরূন এমনকি ইমাম চতুষ্টয়ের যুগেও তাকলীদের ফিতনা দৃষ্টিগোচর হয়নি। ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মে অনারব জাতিসমূহের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। আর তখন থেকেই নিত্য নতুন ফিৎনা মাথা ওঠাতে শুরু করে। তাকলীদও ছিল সেইরূপ একটা ফিৎনা। (যারবুন শাদীদঃ ১২)

গোন্দালবী সাহেব একস্থানে "তাকলীদ ইসলাম গ্রহণের পথে অন্তরায়" নামে একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছেন। এরপর লিখেছেন- "তাকলীদের দ্বারা ইসলাম ধর্ম যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সম্ভবত আর কোন কিছুর দ্বারা ততটা হয়নি। (প্রাগুক্ত ৫৯)

লা-মাযহাবীদের একজন শক্তিধর আলেম মাওলানা আব্দুশ শাকুর হাসবারবী লিখেন- "বিশিষ্টজনদের তো জানাই আছে। আমি সাধারণ মানুষের উদ্দেশে কিছু বলছি। মুক্বাল্লিদীন তথা মাজহাব মান্যকারীরা দশটি কারণে পথভ্রষ্ট এবং নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার প্রথম কারণ বর্তমান হানাফী মাজহাব অবলম্বনকারীদের মধ্যে তাকলীদে শাখসী তথা ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণ পাওয়া যায়। যা স্পষ্ট হারাম এবং নাজায়েজ। (সিয়াহাতুল জিনান-৫) মাওলানা জুনাগড়ীর বক্তব্য হলো যারা নবীগণের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা ছিল তাক্বলীদকারী দল। আসমানী ওহির প্রতি সবচে শক্ত আঘাত হেনেছে যে বস্তুটি তা হলো তাকলীদ। (ত্বরীকে মুহাম্মাদী ঃ ২৩)

তিনি আরও লিখেছেন- সারকথা, সকল যুগে রাসূল আলাইহিমুস সালাম-এর অনুসরণকে সমূলে নিক্ষেপকারী যে অস্ত্রটিকে রাসূলের বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে সেটাই হলো তাকলীদ। তাকলীদের নিন্দায় যদি এই গুটিকয়েক আয়াতই নাযিল হতো তবুও তা জঘন্যতম হারাম প্রমাণিত হওয়ার জন্যে ছিল যথেষ্ট। এটা সেই মারণাস্ত্র যা মানুষকে প্রকৃত ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখে। (ত্বরীকে মুহাম্মাদী ঃ ২৫)

নবাব নূরুল হাসান খান বলেন, তাকলীদকে ওয়াজিব বলা আর বিদআতকে ওয়াজিব বলা একই কথা। (আন-নাহজুল মাকবুল ঃ ১২)

নবাব ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবের কলমের ভাষা নিম্নরূপ-

من اصل البدعة الاحناف والشوافع الجامدون على التقليد التـــاركون لكتاب الله و سنة رسوله

অর্থঃ বিদআতপন্থীদের মধ্যে হানাফী ও শাফেয়ী মাজহাবের লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা তাকলীদের সমর্থনে জড়তুল্য অনড়তার দাবিদার এবং কিতাব ও সুন্নাহ বর্জনকারী। (হাদইয়াতুল মাহদী ঃ ১/১২১)

সম্মানিত পাঠক! এখানে আমি উদাহরণস্বরূপ লা-মাযহাবী আলেমদের কতিপয় লিখিত বক্তব্য পেশ করলাম। এ ধরনের বরং এরচেয়ে আরও

জঘন্য কথাবার্তা তারা নিজেদের বইপত্রে তাকলীদ সম্পর্কে লিখেছে। অধিক দীর্ঘ হয়ে যাবে ভেবে অতিরিক্ত আর কোন উদাহরণ এখানে লেখা হলো না। তাদের এত সব বক্তব্যের পর আমরা কেবল এতটুকু জিজ্ঞেস করতে চাই যে, বড় বড় আকাবির, উলামা এবং স্বয়ং লা-মাযহাবীদের মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ নবাব সিদ্দিক হাসান সাহেবের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। যদ্দারা বোঝা যায়, ঐ সব আকাবির আলেমগণের দৃষ্টিতে তাকলীদ করা জরুরী। এমতাবস্থায় ঐ সব আকাবির উলামা সম্পর্কে লা-মাযহাবীগণ কী ফতোয়া দিবেন এবং স্বয়ং ইমাম বুখারীর অবস্থানটাই বা কোথায় হবে?

বুখারী শরীফের ভিত্তি তাকলীদের ওপর

ইনসাফের নজরে দেখলে অবশ্যই জানা যাবে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) যে বুখারী শরীফ সংকলন করেছেন তার ভিত্তি তাকলীদের ওপর প্রতিস্থাপিত। আর তা এই যুক্তিতে যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) কোন হাদীস গ্রহণ করেছেন তার শায়েখের ওপর আস্থা রেখে এবং সে শায়েখ তার শায়খের ওপর আস্থা রেখে, ঐ শায়েখ নিজের শায়খের ওপর আস্থা রেখে। আর এই আস্থা স্থাপনের ধারাবাহিকতা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। কারও প্রতি আস্থা রেখে তার কথাকে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত মেনে নেয়াকেই তো তাকলীদ বলা হয়। ইমাম বুখারী রহ. নিজের শায়খের নিকট হাদীস শুনেছেন এবং তা সঠিক কিনা এ বিষয়ে তার নিকট কোন দলীল প্রার্থনা করেননি। বিনা দলীলে হাদিসটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এটি তাকলীদ ছাড়া আর কী? কোন লা-মাযহাবী আলেম এ কথা প্রমাণ করতে পারবেন না যে, ইমাম বুখারী (রহ.) কোন হাদীসের হাদীস প্রমাণিত হওয়ার জন্যে স্বীয় শায়েখের নিকট দলীল প্রার্থনা করেছেন। এমনিভাবে ইমাম বুখারী (রহ.) এর শায়েখ তার শায়েখের নিকট। বোঝা গেল, ইমাম বুখারীর সমুদয় রিওয়ায়েতের ভিত্তি হলো এই তাকলীদের ওপর।

ইমাম বুখারী (রহ.) এবং তাবীল

বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করে জানতে পারা যায় যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) আয়াতে মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে তাবীল ও ব্যাখ্যার সমর্থক ছিলেন। এ কারণেই তিনি استوى إلى السماء এ- استوى ক্রিয়াপদটির অর্থ করেছেন ارتفع (সমুন্নত হয়েছে) দ্বারা এবং استوى على العرش এর ব্যাখ্যা করেছেন علا على العرش (আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন) দ্বারা। এ বিষয়ে বুখারী শরীফে তিনি যা লিখেছেন তা নিম্নরূপ–

باب قوله تعالى و كان عرشه على الماء و هو رب العرش العظيم و قال ابو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن و قال مجاهد استوى على العرش علا على العرش

অর্থঃ অধ্যায় আল্লাহ তায়ালার (সূরা হুদে) এরশাদ "তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর" এবং (সূরা তওবায়), "তিনি মহান আরশের অধিপতি"। আবুল আলিয়া استوى على العرش অর্থঃ আকাশের দিকে (উঠে গেছেন) এর ব্যাখ্যা করেছেন "সমুন্নত হয়েছে" দ্বারা। فسواهن এর ব্যাখ্যা করেছেন خلقهن অর্থাৎ "সৃষ্টি করেছেন" দ্বারা। মুজাহিদ বলেন, استوى على العرش এর অর্থ হলো, علا على العرش অর্থাৎ আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু লা-মাযহাবীগণ আয়াতে মুতাশাবিহাতের তাবীল বা ব্যাখ্যা প্রদানকে নাজায়েজ বলেন। সে মতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহয়া গোন্দালবী লিখেন- "ছিফাত তথা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান সালফে সালেহীন, সাহাবা ও তাবেয়ীগণের পথ ও আদর্শ বিরোধী। (আকিদায়ে আহলে হাদীস ঃ ১৫৪)

তিনি উল্লিখিত বিষয়ে কয়েকজন ইমামের উক্তি উল্লেখ করার পর শেষে লিখেছেন-"উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সালফে সালেহীন অর্থাৎ পূর্ববর্তী নেককার আলেমগণ আল্লাহ তাআলার ছিফাতের ব্যাখ্যা প্রদানকে নাজায়েজ মনে করেছেন এবং নিজেরাও তা হতে বিরত থাকতেন। কেননা কুরআন ও হাদিসে এ ধরনের তাবীলকে অনর্থক তামাশা ও উপহাস গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়া তাবীল জায়েজ হওয়ার

ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোন দলীলও পাওয়া যায় না। বরং তাবীলের দরজা খুলেছে খায়রুল কুরূন তথা ইসলামের সোনালীযুগের পর। যা নিঃসন্দেহে তৃতীয় শতাব্দীর পরের কথা। (প্রাগুক্ত ঃ ১৫৫)

পরীক্ষা

২৫০ হিজরীতে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুর গমন করেন (হাদইউস সারী ঃ ৪৯০)

নিশাপুর ছিল তৎকালে ইলমে হাদীসের প্রাণকেন্দ্র। ইমাম মুসলিম এবং তার উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া যুহালীর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বহু হাদীস বিশারদের জন্ম হয় এই নিশাপুরে। তাদের ইলম ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অনেক দূর দূর অঞ্চলেও নিশাপুরের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুরে গিয়ে হাদীসের দরস প্রদানে আত্মনিয়োগ করেন। শহরের উলামায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় সেই দরসে উপস্থিত থাকতেন এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীসের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতেন। স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রহ.) এর এই অবস্থা ছিল যে, তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দরসে কোনদিন অনুপস্থিত থাকতেন না। একদিন তিনি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সামগ্রিকতা ও জ্ঞান গভীরতা দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, তিনি সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ললাটে চুম্বন করে বসলেন এবং আবেগের বশে বলে উঠলেন

دعني اقبل رجليك يا امير المؤمنين في الحديث

অর্থঃ হে হাদীস জগতের মহান সম্রাট! আমাকে আপনার পা চুম্বনের অনুমতি দিন। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া যুহালী (রহ.) এত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উস্তাদ ছিলেন। ছিলেন নিশাপুরের সর্বজনস্বীকৃত বর্ষীয়ান মুহাদ্দিস। তিনি তার সকল ছাত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন ইমাম বুখারীর দরসে উপস্থিত থাকে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধি, বিশেষত্ব ও পূর্ণত্বের প্রভাব মানুষকে এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, ইমাম যুহালীর ন্যায় বুযুর্গগণের হাদীসের মজলিস সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ে। একদিন ইমাম যুহালী (রহ.) স্বীয় মজলিসে বলেন- আমি আগামীকাল মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর

হাদীসের দরসে গিয়ে উপস্থিত হব। যার ইচ্ছে হয় সে আমার সাথে যেতে পারে। সাথে সাথে ইমাম যুহালীর মনে এই কথাও জেগে উঠল যে, ইমাম বুখারীর কারণে আমার দরসগা'য় যে অনুজ্জ্বলতা ও শ্রীহীনতা প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রভাব আমার ছাত্রদের ওপরও পড়েছে। এ জন্যে তাদের মধ্য থেকে কেউ যেন এমন কোন কথা জিজ্ঞেস না করে বসে যদ্দরুন আমার মধ্যে এবং মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে এবং অন্যান্য বাতিল ফিরকা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পারস্পরিক ইখতিলাফের ওপর হাসি-তামাশার সুযোগ পেয়ে যাবে। এ কারণে তিনি সহযাত্রীদেরকে গুরুত্ব সহকারে বলে দেন যে, কেউ যেন ইমাম বুখারীকে কোন ইখতিলাফী মাসআলা জিজ্ঞেস না করে। দ্বিতীয় দিন ইমাম যুহালী রহ. সদলবলে ইমাম বুখারীর মজলিসে গিয়ে হাজির হন। ঘটনাক্রমে সে সমস্যাই দেখা দিল যার আশঙ্কা তিনি করছিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইমাম বুখারী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করল যে, হে আবু আব্দুল্লাহ! কুরআনের যে শব্দ আমাদের মুখ দিয়ে বের হয়, তা কি মাখলুক? তার মূল আরবী বাক্যটি ছিল এরূপ- لفظي بالقرآن مخلوق؟ ইমাম বুখারী শুনে চুপ ছিলেন। লোকটি দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করল। ইমাম বুখারী বাধ্য হয়ে জবাব দিলেন- افعالنا مخلوقة والفاظنا من افعالنـــا অর্থাৎ আমাদের কর্মসমূহ মাখলুক আর আমাদের শব্দসমূহ আমাদের কর্মেরই অন্তর্গত। এই সুক্ষ্ম জবাবটি জনসাধারণ বুঝতে পারল না। এজন্যে ঘটনাটিকে তারা এতটাই অতিরঞ্জিত করে তুলল যে, ইমাম সাহেবের প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধায় ফাটল সৃষ্টি হলো। কিন্তু যারা কথার মারপ্যাচ বুঝতেন এবং সুক্ষ্ম কথা অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন তারা এই জবাবের মর্ম বুঝতে পারলেন। ইমাম সাহেবের প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পেল এবং পূর্বের তুলনায় তাকে আরও অধিক সম্মান করতে থাকেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ছিলেন এ দলেরই একজন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, ইমাম বুখারীর এ জবাবের কারণে ইমাম যুহালীও তার বিরুদ্ধে চলে গেছেন এবং সেই মজলিসে ঘোষণা করেছেন যে "আমাদের মুখে উচ্চারিত কুরআনের শব্দ মাখলুক" এই মতবাদে যারা বিশ্বাসী, তারা যেন আর আমার মজলিসে অংশগ্রহণ না করে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং তার সমস্ত

খাতাপত্র কয়েকটি উটের পিঠে করে ফিরিয়ে দেন। যেগুলোতে ইমাম যুহালীর তাকরীর ও প্রভাষণগুলো লিপিবদ্ধ ছিল। (হাঃ সাঃ ৪৯১)

যখন এই মতবিরোধ একটি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করল তখন ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুরকে মোবারকবাদ জানিয়ে প্রিয় জন্মভূমি বুখারা যাত্রা করেন। বুখারাবাসী যখন জানতে পারল যে, তাদের দেশ-রত্ন পূর্ণতা ও প্রসিদ্ধির কিংখাবে সজ্জিত হয়ে প্রিয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করছেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে শহর থেকে দুই ক্রোশ পথ সামনে এসে স্থানীয় শাসকবর্গ তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর ওপর দিরহাম দীনারের বৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে তাঁকে শহরের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। (হাঃ সাঃ ৪৯৩)

বুখারায় মহান ইমাম এক নির্দিষ্ট মেয়াদ সুখে-শান্তিতে যাপন করেন। কিন্তু শেষে আবার তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। বুখারার গর্ভনর খালেদ বিন আহমাদ যিনি ইমাম বুখারীর সতীর্থ[১] এবং নিজেও একজন মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি মহাত্মা ইমামের বিরোধিতা শুরু করেন। বিরোধিতার হেতু কী ছিল তার একাধিক কার্যকারণ উল্লেখ করা হয়। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) দুটি রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।

১.বুখারার গভর্নর খালেদ বিন আহমাদ যুহালী দূত মারফত ইমাম বুখারীর নিকট এ সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, আপনি স্বীয় বুখারী শরীফ ও তারীখ গ্রন্থদ্বয়ের 'মজলিসে দরস' আমার আস্তানায় এসে কায়েম করুন। ইমাম বুখারী (রহ.) দূতকে জানিয়ে দেন যে, খালেদকে গিয়ে বলবে, আমি রাজা-বাদশাদের দুয়ারে দুয়ারে ফেরী করে বেড়িয়ে ইলমকে অপমানিত করতে পারব না। প্রয়োজন থাকলে আপনি নিজেই আমার বাড়িতে বা মসজিদে এসে গ্রন্থদ্বয়ের পাঠ গ্রহণ করুন। আর এ প্রস্তাব যদি আপনার নিকট অসহ্য ঠেকে তাহলে আপনি তো ক্ষমতাধর শাসক, স্বীয় ক্ষমতাবলে আমাকে দরসদানে বাধা প্রদান করুন। যেন কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর দরবারে ওজর পেশ করতে পারি যে, আমি ইলম গোপন করিনি। আর এভাবেই উভয়ের মধ্যে বিরোধিতার সূত্রপাত ঘটে। (হাঃ সাঃ ৪৯৩)

---

[১]. ইনি ইসহাক বিন রাহওয়াইহ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। যিনি ছিলেন ইমাম বুখারীর উস্তাদ

২. বুখারার গভর্নর খালেদ বিন আহমাদ ইমাম বুখারী (রহ.)কে নির্দেশ করেন যে, আপনি আমার প্রাসাদে এসে আমার সন্তানদেরকে জামে সহীহ ও তারীখ কিতাব দুটি পড়াতে থাকুন। ইমাম বুখারী (রহ.) এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, বিশিষ্টজনদের হাদীস শোনাব আর সাধারণ লোকজন তা শোনার অনুমতি লাভ করবে না। এ কথা গভর্নর খালেদ শোনার পর হারিছ বিন আবুল ওয়ারাক্বাসহ আরও কয়েকজনকে ব্যবহার করেন। তারা ইমাম বুখারীর মর্যাদা পরিপন্থী কতিপয় আপত্তি উত্থাপন করে আর এটাকে পুঁজি করে গভর্নর খালেদ মহাত্মা ইমামকে দেশান্তরিত করেন। (হাঃ সাঃ ৪৯৩) আল্লামা যাহাবী (রহ.) আবু হাফস কাবীর (রহ.) এর জীবনীতে লিখেছেন-

كتب الذهلي إلى خالد امير بخاري و إلى شيوخها بامره فهـــم خالـــد

حتى اخرجه محمد بن احمد بن حفص إلى بعض رباطات بخاري

অর্থঃ মহাত্মা বুখারীর উস্তাদ ইমাম যুহালী (রহ.) বুখারার গভর্নর খালেদ এবং স্থানীয় মাশায়েখদেরকে পত্র মারফত (নিশাপুর) ইমাম বুখারীকে নিয়ে ঘটে যাওয়া সব বিষয়ে অবগত করেন। এরই ওপর ভিত্তি করে গভর্নর খালেদ ইমাম বখারীকে দেশান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর ইমাম আবু হাফস সগীর হানাফী বুখারার কোন এক সীমান্তে পৌঁছা পর্যন্ত ইমাম বুখারীর সঙ্গে গমন করেন। (সিয়ারু আলাম ঃ ১২/৬১৭)

জ্ঞাতব্য ঃ সম্মানিত পাঠক, এখানে একটি বিষয় জেনে রাখুন যে, লা-মাযহাবীদের স্বনামধন্য মুহাক্কিক আলেম মাওলানা ইরশাদুল হক আছারী সাহেব ইমাম বুখারীকে দেশান্তরিত করণের পাঁয়তারায় ইমাম আবু হাফস সগীর হানাফীকেও টেনে আনার ব্যর্থ কসরত দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এই দেশান্তরিত করণের ষড়যন্ত্রে ইমাম আবু হাফস কাবীরের পুত্র শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদও গভর্নর খালেদের সহমগামী ছিলেন।

(ইমাম বুখারী পর বাজ ই'তিরাজাত কা জায়েযা ঃ ১৩)

দলীল হিসেবে আছারী সাহেব আল্লামা যাহাবী (রহ.)-এর উল্লিখিত বক্তব্যটি তুলে ধরেছেন। আমরা বলব, আছারী সাহেবের উক্ত দলীল দ্বারা আলোচ্য ষড়যন্ত্রে ইমাম আবু হাফস সগীর কর্তৃক গভর্নর খালেদকে সহযোগিতাকরণ প্রমাণিত হয় না। তার প্রথম কারণ, আপনারা পেছনে

জেনে এসেছেন যে, ইমাম আবু হাফস সগীর এবং ইমাম বুখারীর মধ্যে যে সুসম্পর্ক তা পূর্বসূরীগত এবং অত্যন্ত সুখময় ছিল। ইমাম আবু হাফস সগীরের পিতা ও ইমাম বুখারীর পিতার মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এমতাবস্থায় একথা বুঝে আসে না যে, ইমাম আবু হাফস সগীর (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)কে স্বদেশ থেকে কেন তাড়িয়ে দেবেন। দ্বিতীয় কারণ, আল্লামা যাহাবী (রহ.) লিখেছেন, ইমাম আবু হাফস সগীর (রহ.) ছাত্র জীবনে বেশ দীর্ঘকাল ইমাম বুখারী (রহ.) এর সহযাত্রী ও ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন। ভ্রমণসঙ্গীর সাথে মানুষের যে সম্পর্ক থাকে তা কারও নিকট গোপন থাকার কথা নয়। তৃতীয় কারণ, আল্লামা যাহাবী (রহ.) ইমাম আবু হাফস সগীর সম্পর্কে লিখেছেন-

كان ثقة اماما ورعا زاهدا ربانيا صاحب سنة واتباع

অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, ইমাম, খোদাভীরু, দুনিয়াত্যাগী, আল্লাহপ্রেমিক এবং সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী। কোন যুক্তিতে এ কথা কি ধরবে যে, এমন ইবাদতগুজার, দুনিয়াত্যাগী এবং খোদাভীরু মানুষ ইমাম বুখারী (রহ.) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে? আছারী সাহেবের মনে হানাফীদের ব্যাপারে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে বলে তিনি যাহাবীর বক্তব্যের ভুল মর্ম উদ্ধার করেছেন। নতুবা বিষয়টি সহজই ছিল যে, যখন ইমাম যুহালীর কথায় গভর্নর খালেদ ইমাম বুখারীকে দেশান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ইমাম আবু হাফস সগীর ছাত্রজীবনের ভ্রমণসঙ্গীর হক আদায় করার নিমিত্তে ইমাম বুখারী (রহ.)কে নিরাপদে বুখারার কোন এক সীমান্তে পৌঁছিয়ে দেন। যেন তিনি অনায়াসে গন্তব্যে চলে যেতে পারেন। কথা এতটুকুই। যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে 'আষাঢ়ে গল্পের' রূপ দেয়া হয়েছে। সম্মানিত পাঠক! আপনারা ইমাম আবু হাফস সগীর সম্বন্ধে আল্লামা যাহাবীর মূল্যায়ন সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন। এখন অনুমান করুন যে, আল্লামা যাহাবীর নিকট তাঁর ব্যক্তিত্ব কতটা উঁচুমানের ছিল। এর বিপরীতে লা-মাযহাবীদের স্বনামধন্য গবেষক আলেম কোন আন্দাজে ইমাম আবু হাফস কাবীর এবং তার পুত্র ইমাম আবু হাফস সগীরের আলোচনা করলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এরা কতটা ইতর শ্রেণীর মানুষ। চিন্তা করুন, এই অবস্থা যদি তাদের উচ্চ জ্ঞানীগুণীদের হয়, তাহলে তাদের নিম্নশ্রেণীর লোকদের কী অবস্থা হতে পারে?

ইমাম বুখারীর মৃত্যু

আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, আবদুল কুদ্দুস বিন আবদুল জাব্বার বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারা থেকে বের হয়ে সমরকন্দের খরতং নামক এক গ্রামে চলে যান। এখানে তার জনৈক আত্মীয়ের বসবাস ছিল। মহাত্মা ইমাম তারই নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। আবদুল কুদ্দুস আরও বলেন, এক রাতে আমি শুনলাম যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাহাজ্জুদ নামাজ শেষ করে এই দোয়া করছেন–

اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني إليك

অর্থঃ হে আল্লাহ এ পৃথিবী অত্যন্ত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে আপনি নিজের কাছে উঠিয়ে নিন। এরপর মাত্র একমাস অতিবাহিত না হতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (হাঃ সাঃ ৪৯৩)

ওয়াররাক আল-বুখারী বলেন- আমি গালেব বিন জিব্রীলকে বলতে শুনেছি, তার কাছেই ইমাম বুখারী (রহ.) খরতং এ অবস্থান করেছেন- "আমাদের নিকট ইমাম বুখারী অল্প কিছুদিন অবস্থান করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে সমরকন্দবাসী ইমাম বুখারীর নিকট দূত মারফত আবেদন জানান যে, আপনি আমাদের নিকট এসে পড়ুন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মোজা পরিধান করেন, মাথায় পাগড়ী বাঁধেন। সওয়ারীতে আরোহণ করার জন্যে প্রায় বিশ কদম অগ্রসর হন, (আমি তার বাহু ধরে রেখেছিলাম) হঠাৎ বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমরা ছেড়ে দেই। এসময় তিনি কিছু দোয়া পড়েন এবং জমিনে শুয়ে পড়েন। আর এরই মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পর তার শরীর মোবারক থেকে খুব বেশি ঘাম নির্গত হয়। তিনি আমাদেরকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমাকে তিনটি বস্ত্রে দাফন দিও। তাতে যেন কামিস ও পাগড়ী না থাকে। সুতরাং আমরা তা-ই করি। কাফন ও জানাযা সেরে যখন আমরা তাকে কবরে নামালাম, তখন কবর থেকে মেশকের ন্যায় তীব্র সুগন্ধি বের হচ্ছিল। এ সুগন্ধি বেশ কয়েক দিন ধরে উঠে আসতে থাকে। লোকজন কবর থেকে মাটি নিয়ে যেতে থাকে। শেষে হেফাজতের জন্যে আমরা কবরের উপর এক প্রকার জালিদার কাষ্ঠ রাখতে বাধ্য হই। (হাঃ সাঃ ৪৯৩)

মৃত্যু তারিখ

আল্লামা ইবনে হাজার লিখেছেন, আবদুল ওয়াহিদ বিন আদম তাবাবীসী বলেন- আমি এক রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করি। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত ছিল। তিনি (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তিনি বললেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর অপেক্ষায় আছি। আমি যখন মহান এই ইমামের মৃত্যু সংবাদ পেলাম তখন হিসাব করে দেখি তা ঠিক ঐ সময়েরই কথা, যে সময়টিতে আমি প্রিয়নবী (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে স্বপ্নে দেখেছিল। ঘটনাটি ছিল শুক্রবার রাতের এবং তা ছিল ঈদেরও রাত। হিজরী ২৫৬ সনে। মৃত্যুকালে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মোট বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম ৬২টি বছর। (হাঃ সাঃ ৪৯৩)

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত ইমাম বুখারীকে এত অফুরন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী করেছিলেন যে, তাঁর কবর মোবারক হতে সৌরভের বন্যা বইতে থাকে। আমাদের জানামতে এত বড় সৌভাগ্য দীর্ঘ চৌদ্দশত বছরে কোন লা-মাযহাবী বুযুর্গের ভাগ্যে তো জোটেনি ঠিক, তবে আকাবিরে দেওবন্দের মধ্য থেকে হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.)-এর সৌভাগ্যে নসিব হয়েছিলো। কিন্তু লা-মাযহাবীরা তা বরদাশত করতে পারেনি। উপরন্তু একে মিথ্যা রটনা প্রমাণ করতে একটি শাহী ফাতাওয়াও প্রকাশ ও প্রচার করে। সুতরাং মাওলানা ইসমাঈল- সালাফী সাহেব একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন, মরহুমের (হযরত লাহোরীর) কবর থেকে সুরভি ছড়িয়ে পড়ার বেশ প্রসিদ্ধি ছিল, শেষে তা-ও মিথ্যা প্রমাণিত হলো। যতক্ষণ গোলাপজল ও আতরের প্রভাব বিদ্যমান ছিল- যা তাঁরই ভক্তবৃন্দ ছিটিয়েছিলো- ততক্ষণ সুবাস বের হতে থাকে। এরপর যখন ভক্ত আশেকের দল আপন আপন কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন এ সৌরভ বেরিয়ে আসার সাঙ্গ ঘটে। (ফাতাওয়া সালাফিয়্যাহঃ ২৩)

সম্মানিত পাঠক! ১৯৬২ সালে হযরত লাহোরীর কবর থেকে এ খোশবু বের হবার কথা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন দূরদূরান্ত থেকে তা প্রত্যক্ষ করার জন্যে এসেছিলো। এমনকি গবেষকগণ সে মাটি গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে রিপোর্টে বলেছিলেন "এ খোশবুর সাথে পার্থিব

জগতের কোন সম্পর্ক নেই"। আজও এমন অনেকে বেঁচে আছেন, যারা ঘটনাটি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা এখনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমরা নিজেরা সে সুরভি নাকে শুঁকেছি, যা কোন পার্থিব সুঘ্রাণ ছিল না। যাই হোক গায়রে মুকাল্লিদরা যদি মানতে না পারেন তো না মানুন। তবে আমরা গর্ববোধ করি যে, এ বিরল সৌভাগ্য আল্লাহ তাআলা দেওবন্দী বুযুর্গগণের নসিবে লিখে রেখেছিলেন, যা তারা পেয়েছেন এবং পেতে থাকবেন। নিকট অতীতেই বিশ্ববাসী আবার প্রত্যক্ষ করেছে যে, জামিয়া আশরাফিয়া লাহোরের শায়খুত তাফসীর এবং শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা রুহানী বাজীকে যখন মাওলানা লাহোরীর কবরের পাশে সমাহিত করা হয়, তখন তাঁর কবর থেকেও কয়েকদিন অবধি সুগন্ধি বের হয়ে আসতে থাকে।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

কবরের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা

আল্লামা যাহাবী (রহ.) লিখেছেন- "আবু আলী গাস্সানী বলেন-৪৬৪ হিজরীর কথা। বালানসীতে আমাদের নিকট শায়খ আবুল ফাতহ্ নাস্র ইবনে হাসান সাকতী সমরকন্দী তাশরীফ নিয়ে আসেন। তিনি বলেন- আমাদের ওখানে সমরকন্দে একবছর এমন হলো যে, বৃষ্টিপাত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকজন কয়েকবার বৃষ্টির জন্যে দোআ করে। কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। একজন প্রসিদ্ধ সৎ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমরকন্দের ক্বাজীর নিকট এসে বললেন- অনুমতি পেলে আমার একটা পরামর্শের কথা বলি। ক্বাজী বললেন বল, কী বলতে চাও। আপনি এবং আপনার সাথে আমরা জনতা চলুন সবাই মিলে হযরত ইমাম বুখারীর কবরের নিকট যাই, যা খরতং নামক স্থানেই বিদ্যমান এবং সেখানে বৃষ্টির জন্যে দোআ করুন। আমি আশাবাদী যে, এতে করে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। ক্বাজী বললেন, খুব ভাল পরামর্শ। সুতরাং তিনি আপামর জনতাসহ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কবরের নিকট আসেন এবং সবাই মিলে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেন ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারা কবরস্থ ব্যক্তির (ইমাম বুখারীর) নিকট ইসতিশফাও করেন, (অর্থাৎ তাকে সম্বোধন করে বলেন-

হে মহাত্মা ইমাম! আপনিও আমাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে রহমতের দোআ করুন) আল্লাহ তাআলা সেই দোআ রোনাজারী এবং ইসতিশফার বদৌলতে এমন রহমতের বান বইয়ে দেন যে, দোআয় আগত লোকজনকে সাত দিন পর্যন্ত খরতং এ অবস্থান করতে হয়েছিলো। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন তারা কেউ সমরকন্দে পৌছুতে পারেননি। অথচ খরতং এবং সমরকন্দর মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র তিন মাইলের।

(সিয়ারু আ'লামঃ ১২/৪৬৯)

জ্ঞাতব্য ঃ এই ঘটনা দ্বারা যেভাবে হযরত ইমাম বুখারীর মৃত্যুপরবর্তী কারামত প্রমাণিত হচ্ছে, সেই একইভাবে এ বিষয়টিও ছাবেত হচ্ছে যে, সে যুগে লোকজন বুযুর্গদের কবর হতে বরকত অর্জন ও 'ইসতিশফা' করাকে জায়েয মনে করতেন। এবং বাস্তবেও তা আমলে আনতেন। আল্লাহ তাআলা বুযুর্গদের তোফায়েলে তাদের দোআ কবুলও করতেন। এমনকি, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কবর থেকে বরকত হাসিল করা হয়েছে। এছাড়া স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আমল দ্বারাও বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কবর থেকে বরকত হাসিল করাকে বৈধ জ্ঞান করতেন। কেননা ইমাম বুখারী (রহ.) তারীখে কাবীর এবং জামে' সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের অধ্যায়সমূহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা মোবারকের পাশে বসেই সুবিন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর মুহাব্বতের দাবিদার লা-মাযহাবীগণ এ কাজকে শিরক ও বিদআত বলে থাকেন। কবি বলেন–

ببیں تفاوت رہ از کجا تا بکجا است

অর্থ ঃ শুধু চাপায় চিড়ে ভিজে না।

ইমাম বুখারীর রচনাবলী

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। নিচে কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো–

(১) قضايا الصحابة والتابعين । এটি তাঁর লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। যা তিনি ২১২ হিজরীতে তারীখে কবীরের পূর্বে লিখেছিলেন।

(২) التاريخ الكبير ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনের আঠারটি বছর মসজিদে নববীতে অবস্থানকালে চাঁদনী রাতগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মোবারকের পাশে বসে রচনা করেছিলেন। এমর্মে আল্লামা যাহাবী (রহ.) ইমাম বুখারীর উক্তি তুলে ধরেছেন–

وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى عليه وسلم في الليالي المقمرة

অর্থঃ আমি এ গ্রন্থটি জ্যোৎস্না রাতগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের পাশে বসে রচনা করেছি।

জ্ঞাতব্য ঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উল্লিখিত আমল দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি কবর থেকে বরকত হাসিল করাকে জায়েয ভাবতেন। সামনে আরও জানতে পারবেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের অধ্যায়সমূহের শিরোনামগুলো মসজিদে নববীর মিম্বার এবং রওজা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে বসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এর দ্বারা আমাদের এ কথার আরও শক্ত সমর্থন মেলে যে, তিনি কবর থেকে বরকত হাসিল করা জায়েয হওয়ার মত পোষণ করতেন। পক্ষান্তরে বর্তমান যামানার আহলে হাদীস সম্প্রদায় একে জায়েয তো নয়ই বরং শিরক মনে করেন।

(৩) التاريخ الاوسط - এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সউদী আরব থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

(৪)الجامع الكبير (٥) التاريخ الكبير

(৬)المسند الكبير (٧) خلق افعال العباد

(৮)كتاب الضعفاء الصغير (٩) التفسير الكبير

(১০) كتاب العلل (١١) اسامي الصحابة

(১২)كتاب المبسوط (١٣) كتاب الوحدان

(১৪)كتاب الهبة (١٥) كتاب الاشربة

كتاب الكنى (১৭) كتاب الفوائد(১৬)

بر الوالدين (১৯) كتاب الرقاق (১৮)

الجامع الصغير (২১)جزء القراءة خلف الامام (২০)

جزء رفع اليدين (২৩) الادب المفرد (২২)

الجامع الصحيح المسند (২৪)

বুখারী শরীফ পরিচিতি

বুখারী শরীফ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এ কিতাবের কারণেই তিনি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, তথা হাদীস জগতের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ইমাম বুখারীর বক্তব্য অনুযায়ী ছয় লক্ষ[২] হাদীসের মধ্যকার এক অতুলনীয় নির্বাচন তার এ গ্রন্থটি। যা দীর্ঘ ষোল[৩] বছরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ গ্রন্থ সংকলনে তিনি যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, এ ব্যাপারে তার বক্তব্য হলো-

ما وضعت في كتابي (الصحيح) حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت

অর্থঃ আমি এ কিতাবের এক একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে গোসল করেছি এবং দু'রাকাত নামায পড়েছি। (সিয়ারু আ'লামঃ ১২/৪০২)

এ কিতাব লেখার সূচনা ঘটে বাইতুল হারামে। অধ্যায় ও তৎসংশ্লিষ্ট শিরোনামগুলো লেখা হয় মসজিদে নববীতে। মিম্বার ও রওজা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন- ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন–

صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام و ما ادخلت فيـــه حـــديثا إلا استخرت الله تعالى و صليت ركعتين و تيقنت صحته قلت الجمع بين هذا

---

[২] সিয়ারুল আলাম ঃ ১২/৪০২

[৩] প্রাগুক্ত ঃ ৪০৫

و بين ما تقدم انه ان كان يصنفه في البلاد و انه ابتدأ تصنيفه و ترتيبـــه و ابوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الاحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها و يدل عليه قوله انه اقام فيه ست عشرة سنة فان لم يجاور بمكة هذه المدة كلها و قد روي ابن عدي عن جماعة من المشائخ ان البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره و كان يصلي لكل ترجمة ركعتين

অর্থঃ আমি আমার জামে' সহীহ কিতাবখানা মসজিদে হারামে লিখেছি। আমি এ কিতাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীস উল্লেখ করিনি যতক্ষণ না ইস্তেখারা করে দু'রাকাত নামাজ পড়েছি আর যতক্ষণ না বিশুদ্ধ হওয়ার একীন লাভ করেছি। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, আমি বলি, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এই উক্তি এবং তাঁর পূর্বোক্ত কথা যে, 'আমি এ কিতাব বিভিন্ন শহরে লিপিবদ্ধ করেছি' উভয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় ঘটানো যেতে পারে যে ইমাম বুখারী (রহ.) এ "জামে সহীহ" এর রচনা, অধ্যায় ও তা বিন্যস্তকরনের সূচনা ঘটিয়েছেন মসজিদে হারামে। এরপর বিভিন্ন শহরে হাদীসসমূহ সংকলন করে গেছেন। আমাদের এ কথা সমর্থিত হয় ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এই উক্তি দ্বারা যে, তিনি বলেছেন- আমি জামে' সহীহ' সংকলনে ১৬ বছর অতিবাহিত করেছি। একেবারে স্পষ্ট কথা যে, তিনি এ দীর্ঘ সময়ের পুরোটা মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করেননি। ইবনে আদী (রহ.) বহু শায়খ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.) জামে' সহীহ'র অধ্যায়সমূহ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কবর মুবারক ও মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম লেখার পূর্বে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছেন।

এ কিতাব লেখার কারণ

আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বুখারী শরীফ সংকলনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। দু'টি কারণ নিম্নে বর্ণিত হলো–

এক. ইমাম বুখারী (রহ.) দেখলেন যে, হাদীস বিষয়ে লিখিত অসংখ্য কিতাবে সহীহ ও হাসান হাদীসের সাথে যয়ীফ (দুর্বল) হাদীসও স্থান পেয়েছে। এজন্যে তার মনে হলো যে, এমন একটি কিতাব সংকলন করা প্রয়োজন যাতে কেবল সহীহ হাদীসই থাকবে। তাঁর এ ইচ্ছা আরও জোরদার হয় এভাবে যে, একবার ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই স্বীয় ছাত্রদের মজলিসে বলেন-

لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থঃ খুব ভাল হত যদি তোমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সহীহ হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব সংকলন করতে। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন- "শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের এ কথা আমার অন্তরে আসন গেড়ে বসে। আর আমিও 'জামে' সহীহ সংকলনের কাজে হাত দিয়ে দেই। (হাঃ সাঃ ৬-৭)

দুই. হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, "স্বপ্নে একবার দেখলাম আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাতে একটি পাখা। আমি সে পাখা দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র শরীরে বাতাস করছি। এরপর আমি একজন স্বপ্ন ব্যাখ্যাতাকে স্বপ্নের কথা জানালাম। তিনি বললেন, আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত জালিয়াতি ও মিথ্যার অপসারণ ঘটাবেন। ঘটনাটি আমার মধ্যে এতটা প্রভাব ফেলল যে, আমি জামে সহীহ'র সংকলন শুরু করে দেই। (হাঃ সাঃ ৭)

এ কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা

আবু জাফর আক্বীলী (রহ.) বলেন, "ইমাম বুখারী (রহ.) জামে' সংকলন সমাপ্ত করার পর নিজের আসাতিযা আলী বিন মাদীনী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রমুখ হাদীসবেত্তাদেরকে দেখতে দেন। তারা কিতাবটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এর হাদীসগুলোকে সহীহ আখ্যা দেন। তবে শুধু চারটি হাদীসের ব্যাপারে তারা আপত্তি তোলেন। আক্বীলী বলেন, সেই চারটি হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মন্তব্যই সঠিক। বস্তুত সে হাদীসগুলোও সহীহ। (হাঃ সাঃ ৪৮৯)

আবু যায়েদ মারওয়াযী (রহ.) বলেন– "আমি বাইতুল্লাহ শরীফের রুকনে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী জায়গায় শুয়েছিলাম। এরই মধ্যে নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করি। তিনি বললেন, আবু যায়েদ! কতদিন আর (ইমাম) শাফিয়ী (রহ.)-এর কিতাব পড়বে। তুমি আমার কিতাবটি কেন পড়ছো না? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কিতাব আবার কোনটি? তিনি এরশাদ করলেন– মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলের জামে'। (হাদইউস সারী ৪৮৯)

বুখারী শরীফের হাদীস সংখ্যা

তাকরার তা'লীক ও মুতাবাআতসহ বুখারী শরীফে বর্ণিত সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা হলো ৯০৮২টি। এ সংখ্যা ইমাম বুখারীর মুখস্থ সহীহ হাদীসসমূহের এক দশমাংশও নয়। তবুও তা মহাত্মা ইমামের অনুপম নির্বাচনের এক অতুলনীয় নমুনা।

বুখারী শরীফের ছুলাছিয়াত

বুখারী শরীফের সর্বোচ্চ মানের রিওয়ায়াত যেগুলোতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইমাম বুখারীর মধ্যে মাত্র তিনজন রাবীর মধ্যস্থতা রয়েছে–যথা- ১.তাবে তাবেঈন ২. তাবেঈ এবং ৩. সাহাবী– এ ধরনের রিওয়ায়েতগুলোকে ছুলাছিয়াত বলে। বুখারী শরীফে মোট বাইশটি ছুলাছিয়াত আছে। তার মধ্য থেকে এগারটি রিওয়ায়েত করা হয়েছে মক্কী বিন ইবরাহীম থেকে। ছয়টি আবু আসেম আন-নাবীল থেকে। তিনটি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল- আনসারী থেকে। একটি খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া আল-কুফী থেকে এবং একটি ই'সাম বিন খালেদ আল-হিমসী থেকে। এই মহান ইমামগণের মধ্যে মক্কী বিন ইবরাহীম বলখী (মৃ. ২১৫ হি.) এবং আবু আসেম আন-নাবীল (মৃ. ২১২ হি.) হলেন ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাক্ষাৎ শাগরেদ এবং ফিক্বহে হানাফী সংকলন বোর্ডের সদস্য। উভয় বুযুর্গকে ইমাম বুখারীর প্রবীণতম শায়খদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তৃতীয় বুযুর্গ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী আলবিসরীও হযরত ইমাম আবু হানিফার শাগরেদ। এই হিসেবে বুখারী

শরীফের মোট বিশটি ছুলাছিয়াতের রাবী হলেন ইমাম আবু হানিফার ছাত্র এবং হানাফী আলেম।

ইমাম বুখারীর কতিপয় শায়খ

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) জামে' সহীহে তাঁর যে সব উসতাদ থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা হলো তিনশ' দশজন। এর মধ্যে পৌনে দুইশতের মত হলেন ইরাকী। আবার ইরাকীদের মধ্য থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন কুফী এবং পঁচাশিজন বসরী। অবশিষ্ট যারা থাকলেন তারা অন্যান্য শহরের। এখানে এবিষয়টিও উল্লেখ করবার মত যে, ইমাম বুখারীর অনেক বিখ্যাত ওস্তাদ এমনও আছেন যারা সরাসরি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র অথবা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্রদের ছাত্র। বরকতস্বরূপ কয়েকটি নাম দেখে নিন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ যারা ইমাম আবু হানিফার ছাত্র–

১. যাহহাক বিন মাখলাদ আবু আসেম আন-নাবীল।
২. আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল-আদাবী আলবিসরী (রহ.) আল-মক্কী আবু আবদির রহমান আল-মুকুরী (রহ.)।
৩.উবাইদুল্লাহ বিন মুসা আল-কুফী (রহ.)।
৪. ফযল বিন আমর (দুকাইন) আবু নুআইম আল-কুফী (রহ.)
৫. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুছান্না আল-আসারী আলবিসরী (রহ.)।
৬. মক্কী বিন ইবরাহীম আলবলখী (রহ.)

যারা ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র

৭. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)।
৮. সাঈদ বিন রবী' আবু যায়েদ আল-হারাবী (রহ.)
৯. আব্বাস বিন ওয়ালীদ (রহ.)।
১০. আলী বিন জা'দ আল-জাওহারী (রহ.)।
১১. আলী বিন হাজর আল-মারওয়াযী (রহ.)।
১২. আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.)।
১৩.মুহাম্মাদ বিন সাব্বাহ আদ-দুলাবী আল-বাগদাদী (রহ.)।

১৪. হিশাম বিন আবদুল মালিক আল-বাহেলী আবুল ওয়ালিদ আত-তয়ালিসী আল-বিসরী (রহ.)।
১৫. হাইছাম বিন খারেজা' (রহ.)।
১৬. ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বিন বুকাইর বিন আব্দুর রহমান আন-নিশাপুরী (রহ.)।

যারা ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্র

১৭. মুহাম্মাদ বিন আমর বিন জাবালা আল-আতীকী আল-বিসরী (রহ.)
১৮. মুহাম্মাদ বিন মুক্বাতিল আবুল হাসান আল- মারওয়াযী (রহ.)
১৯. ইয়াহইয়া বিন সালেহ আল-উহাযী আবু যাকারিয়া আশ-শামী (রহ.)।
২০. ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রহ.)। ইনি ইমাম আবু ইউসুফেরও ছাত্র ছিলেন।

বুখারী শরীফের রিওয়ায়েতকারীগণ

ইমাম বুখারী থেকে জামে' সহীহ শ্রবণকারীদের সংখ্যা যদিও নয় হাজার কিন্তু মহাত্মা ইমামের যে কয়েকজন ছাত্র থেকে যুগযুগ ধরে বুখারী শরীফ বর্ণিত হয়ে আসছে তারা হলেন চারজন।

এক. ইবরাহীম বিন মা'কিল বিন হাজ্জাজ আন-নাসাফী (মৃত: ২৯৪ হি:)
দুই. হাম্মাদ বিন শাকের আন-নাসাফী (মৃত: ৩১১ হি:)
তিন. মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল-ফিরাবরী (মৃত: ৩২০ হি:)
চার. আবু তালহা মানসুর বিন মুহাম্মাদ আল-বাযদুবী (মৃত: ৩২৯ হি:)

এদের মধ্যে প্রথম দুই বুযুর্গ ইবরাহীম এবং হাম্মাদ প্রসিদ্ধ হানাফী আলেম। রাবী চতুষ্টয়ের মধ্যে ইবরাহীম বিন মা'কিল হাফেজে হাদীস হওয়ায় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) ফাতহুল বারীর শুরুতে স্বীয় সনদ-সিলসিলা এই চার বুযুর্গ পর্যন্ত বয়ান করেছেন। এদের সবার মধ্যে ইবরাহীম ও হাম্মাদ ইমাম বুখারী থেকে সর্ব

প্রথম জামে' সহীহ রেওয়ায়েত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কেননা, ইবরাহীম ও হাম্মাদের মৃত্যু যথাক্রমে ২৯৪ ও ৩১১ হিজরীতে সংঘটিত হয়। অপরপক্ষে ফিরাবরী ও আবু তালহার মৃত্যু ঘটে যথাক্রমে ৩২০ ও ৩২৯ হিজরীতে। এটা বাস্তব যে প্রথম দু'জন হানাফী আলেম যদি ইমাম বুখারী থেকে তার 'জামে' রেওয়ায়েত না করতেন তাহলে জামে' সহীহ বর্ণনা করার যিম্মাদারি একাকি ফিরাবরীর ওপর থেকে যেত। আর এভাবে রেওয়ায়েত শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি হয়ে উঠত অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর। আল্লামা যাহেদ কাওসারী (রহ.) এদিকে ইঙ্গিত করেই লিখেছেন–

هذا البخاري لولا ابراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر الحنفيان ينفرد الفربري عنه في جميع الصحيح سماعا- (التعليق على شروط الأئمة الخمسة للحازمي صـ ٨١ ، طبع في ابتداء ابن ماجة ، طبع قديمي كتب خانه كراجي)

অর্থঃ যদি ইবরাহীম বিন মা'কিল এবং হাম্মাদ বিন শাকের এ হানাফী আলেমদ্বয় না হতেন তাহলে পূর্ণ জামে সহীহ'র সেমা ও শ্রবণকরার ক্ষেত্রে ফিরাবরী মুনফারিদ তথা একা থেকে যেতেন অন্য কথায় বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে যে, ৩১১ হিজরী পর্যন্ত বুখারী শরীফ রেওয়ায়েতের মূল কেন্দ্রের ভূমিকায় ছিলেন একমাত্র হানাফী আলেমগণ।

সম্মানিত পাঠক! বুখারী শরীফ সম্পর্কে আর অধিক বিশ্লেষণে না গিয়ে এবার সামনে অগ্রসর হব। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) যে পরিমাণ গুরুত্ব সহকারে বুখারী শরীফ সংকলন করেছিলেন আল্লাহ তাআলা সেই পরিমাণ মাকবুলিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতা এই কিতাবখানাকে দান করেছেন। প্রত্যেক যুগের সকল মাজহাব ও মাসলাকের উলামায়ে কেরাম এ কিতাবের পঠন পাঠন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নিয়োজিত থেকেছেন। আজোবধি এ ধারাবাহিকতা স্বমহিমায় অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

বুখারী শরীফ এবং ইমাম বুখারীর সাথে লা-মাযহাবীদের আচরণ

এই মুহূর্তে প্রয়োজন বোধ করছি, আহলে হাদীস আলেমগণের ঐ সকল আলোচনাও পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরি যেগুলোতে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দাবির পাশাপাশি ইমাম বুখারী এবং বুখারী শরীফের ওপর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

বুখারী শরীফ অগ্নিগর্ভে

বিখ্যাত পর্যটক আখতার কাশমিরী নিজের 'সফরনামায়ে ইরান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন- এই মিশনের সর্বশেষ বাগ্মী গুজরান ওয়ালার আহলে হাদীস আলেম মাওলানা বশিরুর রহমান ছিলেন অতুল ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন অনন্য পুরুষ। অত্যন্ত ভাল মানুষ তিনি। আপন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের সাথে তার বিশাল দেহ সৌষ্ঠবও ছিল নজরকাড়া। তার বক্তব্যদানের ধরন এত মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, তার তুলনা হয় না। তিনি বলেছেন- "এতক্ষণ যা বলা হলো তা অবশ্যই গুরুত্ব পাবার মত। কিন্তু আমলযোগ্য নয়। মতবিরোধের পরিসমাপ্তি অবশ্যই কাম্য। কিন্তু মতবিরোধের অবসান ঘটানোর পূর্বে তার কার্যকারণসমূহকে বিলুপ্ত করতে হবে। উভয় পক্ষের যে সব কিতাব আপত্তিকর সেগুলোর বিদ্যমানতায় মতবিরোধিতার অগ্নিকুণ্ড দিনে দিনে হয়ে উঠেছে আরও লেলিহান। আরও ধ্বংসোদ্দীপক। আসুন না, আমরা মতভিন্নতার উৎসগুলোকেই খতম করে ফেলি। যদি আপনারা খাঁটি মনে একতার আশা করে থাকেন তাহলে ঐ সমস্ত রেওয়ায়েতকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে যেগুলো পারস্পরিক মনোমালিন্যের কারণ হচ্ছে। আসুন, আমরা বুখারী শরীফকে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করি, আর আপনারা উসূলে কাফী'কে বহ্নির কোলে সঁপে দিন। আপনারা আপনাদের ফিক্বাহ শাস্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলুন। আমরা আমাদের ফিক্বাহ শাস্ত্রকে মিটিয়ে ফেলি। (آتش کدۂ ایران ص ۱۰۷)

ইমাম বুখারীর প্রতি আপত্তি

সিহাহসিত্তার অনুবাদক আল্লামা ওয়াহিদুযযামান (সালাফী) ইমাম বুখারীর প্রতি আপত্তি তুলে বলেন- "হযরত জাফর সাদেক (রহ.) বার ইমামের প্রসিদ্ধ ইমাম এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত ফক্বিহ ও হাদীসের হাফেজ

ছিলেন। তিনি ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফারও শায়খ ছিলেন। কিন্তু কী জানি ইমাম বুখারীর কী হয়েছিল যে, তিনি বুখারী শরীফে ইমাম জাফর সাদেকের কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাআলা ইমাম বুখারীর প্রতি রহম করুন। তিনি মারওয়ান, ইমরান বিন হাত্তান এবং আরও কতিপয় খারেজী থেকে তো হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, কিন্তু নবী বংশের মহান ইমাম হযরত জাফর সাদেক কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসে সন্দেহ করে বসেছেন। (লুগাতুল হাদিস-৩৯/২)

বুখারী শরীফের এক রাবী'র ব্যাপারে আপত্তি

নবাব ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব বুখারী শরীফের একজন রাবী মারওয়ান ইবনুল হাকামের ওপর আপত্তি তুলে বলেন- হযরত উসমান (রা.) যতসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তা কেবল হতভাগা মারওয়ানের কারণে। আল্লাহই তার সাথে বোঝাপড়া করুন। (লুগাতুল হাদিস-২১৩/২)

হাকীম ফয়েজের দৃষ্টিতে বুখারী শরীফ

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) ইফকের ঘটনা সম্পর্কে যে সকল হাদীস বুখারী শরীফে উল্লেখ করেছেন সেগুলোর অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে লিখেছেন- "ঐসব মুহাদ্দিস, ঐসব হাদীস ব্যাখ্যাতা, ঐসব জীবনীকার এবং ঐসব তাফসীরকারকের পরানুকরী মস্তিস্কের ওপর মাতম করতে ইচ্ছে হয়, যারা এতটুকু বিষয়ের যাচাই ও গবেষণা করতেও অক্ষম যে, ঘটনাটি ভুল না সঠিক। কিন্তু এ ধর্মগত ও গবেষণা সংক্রান্ত সৎসাহসের অভাব হাজারও জটিলতা সৃষ্টি করেছে এবং সৃষ্টি করতে থাকবে। আমাদের ইমাম বুখারী (রহ.) তার বুখারী শরীফে যা কিছু সংকলন করেছেন তা সহীহ এবং সন্দেহমুক্ত। চাই তা আল্লাহ তাআলার উলূহিয়াত বা প্রভুত্ব, নবীগণের নিষ্পাপতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রাত্মা স্ত্রীদের অনাবিল আকাশে কলঙ্কের কালিমা লেপন করে দিক। এটা কি ইমাম বুখারীর ঐরূপ অন্ধ অনুকরণ নয় মুক্বাল্লিদরা যেরূপ তাদের চার ইমামের বেলায় করে থাকে? (صدیقۂ کائنات : ۱۰۲)

ইমাম বুখারী কি সমালোচনার উর্ধ্বে?

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন- "বস্তুত ইমাম বুখারী (রহ.) এই রেওয়ায়েতের প্রশ্নে (ইফকের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে) আমার দৃষ্টিতে সমালোচনার উর্ধ্বে। কাহিনীকারের কৌশলী হাতের তরবারী চালনার সামনে এ ঘটনার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের যাবতীয় যোগ্যতা অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলে। (صدیقۂ کائنات : ۱۰۲)

আহলে হাদীস ভাইগণ একটু চিন্তা করে জবাব দেবেন। হাদীসের ব্যাপারে তার যে গবেষণা ও পর্যালোচনার সন্ধান মেলে, তা কী করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

বুখারী শরীফে 'জাল' রেওয়ায়েত (?)

হাকীম ফয়েজ সাহেব হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়সের আলোচনায় আবারও লেখেন- এখন এক দিকে বুখারী শরীফে নয় বছর বয়সের রেওয়ায়েত, অপরদিকে এত শক্তিশালী ঘটনা ও দলীল বিদ্যমান রয়েছে, যা দৃষ্টে স্পষ্ট মনে হয়, নয় বছর বয়সের বর্ণনাটি একটা মিথ্যা ও জাল উক্তি। যেটাকে কোন সাহাবীর বক্তব্য বলে মন্তব্য করা ছাড়া আমাদের আর কিছু বলার নেই। (صدیقۂ کائنات : ۸)

বুখারী শরীফের একজন কেন্দ্রীয় রাবী'র সমালোচনা

হাকিম ফয়েজ আলম সাহেব বুখারী শরীফের একজন কেন্দ্রীয় রাবী এবং মহামর্যাদাশীল তাবেয়ী হওয়ার সাথে সাথে হাদীসের সর্বপ্রথম সঙ্কলক ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.)-এর সমালোচনায় লিখেন- "ইবনে শিহাব জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মুনাফিক ও মিথ্যুকদের বিশেষ এজেন্ট ছিলেন। অধিকাংশ বিভ্রান্তিকর হাদিছ ও মিথ্যা রেওয়ায়েত তার দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়। (صدیقۂ کائنات : ۱۰۷)

তিনি আরও লিখেছেন- "ইবনে শিহাব সম্পর্কে একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি এমন ব্যক্তিবর্গ থেকেও কোন মধ্যস্থতা ছাড়া হাদীস বর্ণনা করতেন যারা তার জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বিখ্যাত শিয়া

লেখক শায়খ আব্বাস কুমী বলেন- ইবনে শিহাব প্রথমে সুন্নী ছিলেন, পরে তিনি শিয়া মত গ্রহণ করেছিলেন। (تتمة المنتهى : ١٢٨) عين الرجال في اسماء الرجال নামক কিতাবেও ইবনে শিহাবকে শিয়া বলা হয়েছে। (صديقة كائنات : ١٠٨)

সম্মানিত পাঠক! আল্লামা ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব ও হাকিম ফয়েজ আলম সাহেব ইমাম বুখারী ও ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) সম্পর্কে যে বিরূপ সমালোচনা করে গেলেন, এখন লা-মাযহাবীদের উচিৎ তারা বুখারী শরীফ থেকে নিজেদের নির্ভরতা তুলে নেবেন এবং বুখারী শরীফের শত শত ঐ সব হাদীস থেকেও হাত ধুয়ে নেয়া উচিৎ যেগুলোর বর্ণনা সূত্রে ইবনে শিহাবের নাম রয়েছে। বিশেষ করে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.-এর "রফে ইয়াদাইন" এবং হযরত উবাদা (রা.)-এর কেরাতে ফাতেহা সংক্রান্ত হাদিসদ্বয় থেকে তো একেবারে হাত গুটিয়ে নেয়া কর্তব্য। কেননা, এ হাদীস দু'টির সনদে এই ইবেন শিহাব বিদ্যমান। এবার দেখতে থাকুন, লা-মাজহবীগণ কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?

অবুখারীর হাদীসকে বুখারী শরীফের হাদীস বলে অপপ্রচার

লা-মাযহাবীগণ বুখারী শরীফ সম্পর্কে এতটাই অসতর্ক যে, তারা নির্দ্বিধায় যে কোন হাদীসকে বুখারী শরীফের হাদীস বলে উল্লেখ করে থাকেন। অথচ সে হাদীসটি একেবারেই বুখারী শরীফের নয় অথবা তা যে আলফায বা শব্দের সাথে তারা উল্লেখ করেছেন সেভাবে বুখারী শরীফে নেই। নিম্নে পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে দু'চারটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

এক. লা-মাযহাবীদের শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী রাসূলে আকরাম কি নামাজ নামক বইয়ের ৪৮ নং পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه و إذا كبر للركوع فعل مثله و إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله و إذاقال ربنا لك

الحمد فعل مثله و لايفعل ذلك حين يسجد و لا حين يرفع رأسه من السجود (سنن كبري جـ٢ صـ٦٨ ، ابوداؤد جـ١ صـ١٦٣ صحيح بخاري جـ١ صـ١٠٢ الخ)

এই আলফাযের সাথে হাদীসটি বুখারী শরীফে নেই। হয়ত লা-মাযহাবীগণ বলবেন এ আলফাযের সাথে নেই ঠিক, কিন্তু এই মা'না বা মর্মে তো হাদীসটি বুখারীতে আছে। আমরা বলব তাদের উক্ত ধারণাও ঠিক নয়। আর তা এজন্যে যে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা চার স্থানে রফে ইয়াদাইন প্রমাণিত হচ্ছে-

১. তাকবীরে তাহরিমার সময় ২. রুকুতে যাওয়ার সময় ৩. سمع الله لمن حمده বলার সময় এবং ৪. ربنا لك الحمد বলার সময়। অথচ বুখারী শরীফে মাত্র তিন স্থানে রফে ইদাইনের কথা উল্লেখ আছে।

দুই. লা-মাযহাবীদের শায়খুল কুল ফিল কুল মুফতী আবুল বারাকাত আহমাদ সাহেব একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন- "বুখারী শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস আছে যে, তোমরা তিন রাকাত বেতের পড় না। তা মাগরিবের সদৃশ হয়ে যাবে।" এমন হাদীস বুখারী শরীফ দূরের কথা পুরা সিহা সিত্তায়ও নেই।

তিন. হাকিম সাদেক সিয়ালকোটি সাহেব লিখেছেন- "অথচ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও সাফ সাফ বলে দিয়েছেন যে, افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها অর্থাৎ সর্বোত্তম আমল হলো, নামাজকে তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। (سبيل الرسول : ٢٤٦) উক্ত অর্থে হাদীসটি পুরো বুখারী শরীফের কোথাও নেই।

চার. হাকিম সাদেক সাহেব আরেকটি হাদীস নিম্নোক্ত আলফাজের সাথে উল্লেখ করেছেন-

عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى عليه وسلم و ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

অর্থঃ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরের যুগে এবং উমর (রা.)-এর

খেলাফতের প্রথম দু'বছরে এক শব্দে তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হত। (سبيل الرسول : ٢٦٨)

পুরো বুখারীতে এই শব্দে এবং মর্মে হাদীসটির চিহ্নমাত্র পাওয়ার উপায় নেই।

পাঁচ. তিনি صلوۃالرسول নামক কিতাবের ২১৮ নং পৃষ্ঠায় "رکوع کی دعائیں" শিরোনামের অধীনে চতুর্থ নম্বরে নিম্নোক্ত দোআটি লিখেছেন-
سبحان ذي الجبروت و الملكوت والكبرياء والعظمة

আর উদ্ধৃতি দিয়েছেন বুখারী-মুসলিমের। অথচ হাদীসটি না বুখারী শরীফে আছে আর না আছে মুসলিমে শরীফে।

ছয়. তিনি একই কিতাবের ১৫৩ নং পৃষ্ঠায় اذان کی جفت کلمات শিরোনামের অধীনে আযানের বাক্যগুলো উল্লেখ করেছেন। এখানেও তিনি বুখারী ও মুসলিমেরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ আযানের এ বাক্যগুলো বুখারী-মুসলিমে নেই।

সাত. তিনি এই কিতাবেরই ১৫৩ নং পৃষ্ঠায় تکبیر کے طاق کلمات নামে একটি শিরোনাম উল্লেখ করে তাকবীরের শব্দগুলো লিখেছেন। আর হাওয়ালা দিয়েছেন বুখারী-মুসলিমের। কিন্তু সত্য হলো, তাকবীরের এই শব্দগুলো বুখারী ও মুসলিমে নেই।

আট. হাকিম সাহব এই কিতাবের ১৫৬ নং পৃষ্ঠায় اذان کا طریقہ اور مسائل শিরোনামটির অধীনে লিখেছেন-

حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف مڑیں اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف مڑیں ولایٔ ستدر اور گھومیں نہیں یعنی دائیں اور بائیں طرف گردن موڑیں گھوم نہیں جانا چاہیے (بخاری و مسلم

অর্থঃ حى على الصلاة বলার সময় চেহারা ডান দিকে ফেরাবে আর حى على الفلاح বলর সময় বাঁ দিকে। কিন্তু সিনা ঘোরাবে না। অর্থাৎ ডানে আর বাঁয়ে শুধু গর্দান ফেরাবে। একেবারে ঘুরে যাবে না।
(বুখারী ও মুসলিম)

হাকিম সাহেব মাসআলাটি বুখারী মুসলিমে আছে বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ বুখারী-মুসলিমে তা নেই।

বুখারী শরীফের ভুল উদ্ধৃতি

সম্মানিত পাঠক! লা-মাযহাবীগণ যখন কোন আমল গ্রহণ করে তখন চাই তা যতই ভুল হোক সেটা প্রমাণ করতে তারা বেঠিক বয়ান ঝাড়তেও দ্বিধাবোধ করে না। সম্পূর্ণ নির্দ্বিধায় বুখারী শরীফের ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে মুখ বুঁজে থাকে। অথচ বুখারী শরীফে সেই উদ্ধৃতির কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনই দু'চারটি উদ্ধৃতি পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

এক. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেব লিখেছেন- "বুকের ওপর হাত বাঁধা ও রফে ইয়াদাইন বিষয়ক হাদীস বুখারী-মুসলিম এবং এতদুভয়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে (একটি দু'টি নয়) অসংখ্য- রয়েছে। (فتاوی ثنائیہ ج ا ص ۴۴۳)

মাওলানা সাহেবর এ কথা একেবারে ভুল। বুখারী-মুসলিমে বুকের ওপর হাত বাঁধার অসংখ্য রেওয়ায়েত দূরের কথা একটি রেওয়ায়েতও নেই।

দুই. 'ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে হাদীস' নামক কিতাবের এক প্রশ্নের উত্তরে লেখা হয়েছে- উত্তর: সহীহ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে হাত তুলে বা বেঁধে দোআ কুনূত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা দোআ হওয়ার কারণে উভয় হাত উত্তোলন করে পড়া উত্তম। রুকুর পরে দোআ কুনূত পড়া মুস্তাহাব। বুখারী শরীফে রুকুর পরের কথা আছে। (فتاوی علماء حدیث ج ۳ ص ۳۰۲) লা-মাযহাবী মুফতী সাহেবের এই উত্তরটি একেবারেই ভুল। বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করে দেখুন। পুরো বুখারী শরীফে বেতের নামাযে দোআ কুনূত রুকুর পরে পড়ার কথা কোথাও বলা হয়নি। বরং এর উল্টো রুকুর পূর্বে পড়ার কথা কয়েক স্থানে আছে।

তিন. মাওলানা হাবীবুর রহমান ইয়াযদানী এক খুৎবায় বলেছেন-

"মাথায় পাগড়ী বা টুপি থাকলে তার ওপর মাসাহ করা যায়। মোজা এবং জাওরাবের ওপরও মাসাহ করা জায়েয আছে। ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন المسح علـى الجـوربين (জাওরাবের ওপর মাসাহ)। ইয়াযদানী সাহেবের উরোক্ত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পুরো বুখারী শরীফ পড়ে ফেললেও জাওরাবের ওপর মাসাহ নামে কোন অধ্যায় আপনার দৃষ্টিগোচর হবে না। ইয়াযদানী সাহেব নিজের পক্ষ থেকে বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় বৃদ্ধি করেছেন। অন্যথায় বুখারী শরীফে এ নামে কোন অধ্যায় নেই। সম্মানিত পাঠক! সংক্ষেপ করার ইচ্ছায় এই বিষয়ের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এখন বুখারী শরীফের ঐসব হাদীস এবং ইমাম বুখারীর ঐসব ইজতিহাদ আমরা উল্লেখ করব, লা-মাযহাবীগণ যেগুলো অনুযায়ী আমল না করে তার বিপরীত আমল করেন।

ইমাম বুখারীর ইজতিহাদ এবং তার উল্লেখকৃত হাদীসসমূহ যে গুলোর ওপর লা-মাযহাবীদের আমল নেই

ফিক্বাহ এবং ফিক্বাহ্‌বিদগণের শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৬ নং পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন باب من يرد الله به خيرا يفقـــه في الـــدين অর্থাৎ আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফিক্বহ তথা গভীর জ্ঞান দান করেন। এর অধীনে তিনি লিখেছেন-

قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين و إنما انا قاسم والله يعطي و لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله

অর্থঃ হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বলেন, আমি হযরত মুআবিয়া (রা.)কে খুৎবা প্রদানকালে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি

হলাম বণ্টনকারী আর প্রকৃতদাতা আল্লাহ তায়ালা। এই উম্মত সর্বদা দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহর নির্দেশ তথা কেয়ামত পর্যন্ত কারও বিরোধিতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই হাদীসে ফক্বীহগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা, দ্বীনের গভীর জ্ঞান ফক্বীহগণই অর্জন করতে পারেন। আর ইলমে ফিকহে পারদর্শী ব্যক্তিকেই যেহেতু ফক্বীহ বলা হয় তাই হাদীস দ্বারা ফিকাহ শাস্ত্রের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বও জানা গেল। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথম খণ্ডের ৪৭৯ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تَجِدُونَ النَّــاسَ مَعَـــادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّة خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوْا

অর্থঃ সমস্ত মানুষ খনিতুল্য। যারা জাহেলী যমানায় শ্রেষ্ঠ ছিল তারা ইসলামের যুগেও শ্রেষ্ঠ গণ্য হবে। তবে যখন ফক্বীহ হবে। আল্লামা নববী (রহ.) শরহে মুসলিমে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وفقهوا بضم القاف على المشهور و حكي كسرها اي صاروا فقهـــاء عالمين بالاحكام الشرعية الفقهية (شرح مسلم للنووي جـــ٢ صـــ ٢٦٨)

অর্থঃ হাদীসটিতে "যখন ফক্বীহ হবে" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শরীয়তের বিধিবিধান অর্থাৎ ফিক্বাহ বিষয়ে পারদর্শী হওয়া।

বুখারী শরীফের উক্ত বর্ণনা দ্বারাও ফিকহ এবং ফিক্বাহবিদগণের মহত্ব শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট জানা যাচ্ছে। ইমাম বুখারী (রহ.) তার জামে' সহীহ'র ২৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটিও উল্লেখ করেছেন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার ইস্তিঞ্জাখানায় গমন করলেন।) আমি তাঁর জন্যে ওজুর পানি এনে রেখে দিলাম। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, পানি রেখেছে কে? তাঁকে জানানো হলে তিনি আমার জন্যে দোআ করলেন, হে

আল্লাহ! তাকে (ইবনে আব্বাসকে) দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান কর। উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দৃষ্টিতেও দ্বীনের গভীর জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ কারণেই তিনি আপন চাচাত ভাইয়ের জন্যে উক্ত দোআটি করেছিলেন। বুখারী শরীফের উল্লিখিত রেওয়ায়েত দ্বারাও ফিক্বাহ ও ফুক্বাহায়ে কেরামের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত উক্তিটি উল্লেখ করেছেন- كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء অর্থ: তোমরা আল্লাহওয়ালা হও। অর্থাৎ প্রজ্ঞা জ্ঞান এবং দ্বীনের গভীর বুঝ অর্জন কর।

১৭ পৃষ্ঠায় তিনি হযরত উমর (রা.)-এর নিম্নলিখিত বাণীটি রেওয়ায়েত করেছেন- تفقهوا قبل ان تسودوا

অর্থঃ তোমরা নেতৃত্ব লাভের পূর্বে ফিক্বাহ অর্জন কর। (শরীয়তের হালাল-হারামের জ্ঞান লাভ কর।) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এবং হযরত উমর (রা.)-এর উপরোক্ত এরশাদ দ্বারাও ফিক্বাহ এবং ফক্বীহগণের শান ও মর্যাদা প্রতিপন্ন হলো। পিছনে আপনারা হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জবানিতে পড়ে এসেছেন যে, তিনি শিক্ষা জীবনের শুরুতে হাদীসের সাথে সাথে ফিকাহর প্রতিও মনোযোগ দিয়েছিলেন। ইমাম ওয়াকী, আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের ফিকহ সম্বলিত হাদীসের কিতাবসমূহও কণ্ঠস্থ করে নিয়েছিলেন। এবং বুখারাতেই তিনি জামে সুফিয়ান শ্রবণ করেছিলেন আর তা ফিক্বাহ বিষয়ক কিতাবই ছিল। আল্লামা যাহাবী বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন-

ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم و حتى نظرت في عامة كتب الرأي و حتى دخلت البصرة خمس مرات او نحوها فما تركت بها حديثا صحيحا إلا كتبته الامالم يظهر لي (سير اعلام النبلاء ، جـ ١٢ صـ ٤١٦)

অর্থঃ আমি তিনটি কাজ না করা পর্যন্ত হাদীস পড়াতে শুরু করিনি।

এক. সহীহ হাদীসকে যয়ীফ থেকে পৃথক করতে শিখেছি। দুই. ফিক্বাহর প্রসিদ্ধ কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছি। এবং তিন. যতক্ষণ না বসরায় পাঁচ, সাত বার গমন করেছি। এরপর আমি সেখানকার যাবতীয় সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তবে যেগুলো আমার সামনে আসেনি সেগুলোর কথা আলাদা। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উক্ত বাণী হতে জানতে পারা যায়, হাদীসের দরস প্রদান করার পূর্বে যেরূপ হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান- যদ্বারা সহীহ হাদীসকে যয়ীফ হাদীস থেকে পৃথক করা যায়- অর্জন করা উচিৎ, অনুরূপ ইলমে ফিক্বাহও অর্জন করা উচিৎ যেন হাদীস থেকে মাসায়েল ইসতিমবাত (গবেষণা করে বের) করা যায়। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এ ঘটনা তো বেশ প্রসিদ্ধ যে, আপন কৈশোরে যখন কাজী ওলীদ বিন ইবরাহীম ইমাম বুখারীর নিকট হাদীস শাস্ত্রে পড়াশোনা করার পরামর্শের জন্যে আসেন, তখন তিনি তাকে কামেল মুহাদ্দিস হওয়ার যে সব শর্তের কথা বলেন, ওয়ালীদ বিন ইবরাহীম তা শুনে পেরেশান হয়ে যান। এরপর হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) তাকে বলেন-

فان لاتطق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه وانت في بيتك قار ساكن لا تحتاج إلى بعد الاسفار و وطي الديار و ركوب البحار و هو مع ذا ثمرة الحديث وليس ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الاخرة و عزه باقل من عز المحدث

অর্থঃ যদি তুমি এ সমুদয় কষ্ট বহনে সমর্থ না হও, তাহলে ফিক্বাহ শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা কর। যা তুমি ঘরে বসে থেকে অর্জন করতে পারবে। এর জন্যে তোমাকে দূর দূরান্তের ভ্রমণ করতে হবে না। হবে না দেশে দেশে যাতায়াত করতে। এ উদ্দেশ্যে তোমার সমুদ্র যাত্রা আবশ্যক নয়। তা সত্ত্বেও ফিকাহ হাদীসেরই ফল। আর আখিরাতে ফিকাহবিদদের ছাওয়াব ও সম্মান হাদীস বিশারদদের ছাওয়াব ও সম্মানের চেয়ে কোন অংশ কম হবে না। লক্ষ্য করুন! হযরত ইমাম বুখারীর নিকট একজন ছাত্র হাদীস শাস্ত্রে অধ্যয়ন করার পরামর্শের জন্যে আসে। তিনি তার সামনে কামেল মুহাদ্দিস হওয়ার যে সব শর্ত তুলে ধরেন, তা পূরণে অক্ষম দেখে তিনি ছাত্রটিকে ফিক্বাহ নিয়ে পড়াশোনা করতে বললেন। উপরন্তু

তাকে সান্ত্বনা স্বরূপ এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে, ইলমে ফিক্বাহ অর্জনে সহজ হওয়ায় এ কথা ভেব না যে এটা কোন নগণ্য বিষয়। বরং এ শাস্ত্র তো হাদীস শাস্ত্রেরই নির্যাস ও পরিণাম। অর্থাৎ হাদীসের পঠন পাঠন তো এ উদ্দেশ্যেই যেন দ্বীনী আহকামের জ্ঞান অর্জিত হয়। আর দ্বীনী আহকাম তথা ইসলামী বিধি-বিধান জানার নামই তো ফিক্বাহ। অধিকন্তু তাকে এ সুসংবাদও শুনিয়ে দিলেন যে, দেখ! আখিরাতে ফকীহ এর ছাওয়াব ও সম্মান মুহাদ্দিসের ছাওয়াব ও সম্মানের চেয়ে কোন অংশে কম হবে না। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, তাঁর নিকট ফিক্বাহ এবং ফুক্বাহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এ জন্যেই তিনি ফিক্বাহ নিয়ে পড়াশোনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদি ফিক্বাহ এবং ফুক্বাহা তার দৃষ্টিতে কোন নগণ্য বিষয় হত তাহলে তিনি তা নিয়ে লেখা-পড়া করার পরামর্শ দিতেন না। কিন্তু হযরত ইমাম বুখারীর এ দৃষ্টিভঙ্গির উল্টো লা-মাযহাবীগণ ফিক্বাহ এবং ফুক্বাহায়ে কেরামের এই পরিমাণ বিরোধী যে, নাউযুবিল্লাহ বিশেষ করে হানাফী ফিক্বাহর প্রতি তাদের যে বৈরীভাব তা বলার মত নয়। এমন কোন দিন নেই, যাতে তারা হানাফী ফিক্বাহর বিরুদ্ধে কোন লিফলেট পুস্তিকা বা বই ছাপিয়ে অপপ্রচার না চালায়। কিছু আহলে হাদীস তো ফিক্বহে হানাফীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত গর্হিত ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করেন, যা পাঠ করলেও ঘৃণা জন্মে যায়। ফিক্বহে হানাফীর বিরুদ্ধে তাদের কতিপয় বক্তব্য উদাহরণস্বরূপ নিম্নে তুলে ধরছি। হাকিম ফয়েজ আলম লিখেছেন- "আমি বারবার এ বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা জরুরী মনে করি যে, আজ হানাফি ফিক্বা'র নামে যত বই-পুস্তক –যা লাহওয়াল হাদীসের (অর্থাৎ মন ফুসলানো কথা-বার্তার) সমষ্টি হিসেবে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের একটি অংশকে গোমরাহ বানাবার কারণ বনছে– তার একটি শব্দও হযরত ইমাম আবু হানিফার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। (اختلاف امت کا المیہ ص ۱۴)

তিনি আরও লিখেছেন- "আমাকে এ কথা বলার অনুমতি দিন যে, আজ ফিক্বহে হানাফীর নামে মনোরঞ্জক বাচালতার যে স্তুপ আমাদের মাঝে প্রচলিত এবং প্রচারিত হয়ে আসছে তার একটি বর্ণও সাইয়্যেদুনা ইমাম আবু হানিফার বলে প্রমাণ করা যাবে না। আর না কেউ আজ পর্যন্ত

প্রমাণ করার সাহস দেখাতে পেরেছে। এক্ষেত্রে সাবায়ীদের দৃশ্যপনা এবং রাফেযীদের চৌর্যবৃত্তিতে উৎসাহী দেখে হানাফীদেরকে আমার স্বত:স্ফূর্তভাবে 'বাহবা' দেয়ার সাধ জাগে। (اختلاف امت کا المیہ ص ۳۱۲)

হাকিম সাহেবের মত তাদের সম্প্রদায়ের আরও অনেকেই এ দাবিই করে থাকেন। কিন্তু তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাদের বক্তব্যের ভ্রান্তি প্রমাণের জন্যে হযরত ইমাম আবু হানিফার মুসনাদ, কিতাবুল আছার এবং তার দুই শাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদ ও ক্বাজী আবু ইউসুফের কিতাবাদি অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট। আল-হামদুলিল্লাহ! এ সব কিতাব প্রকাশিতও হয়েছে। সেগুলো পাঠ করে দেখুন, ফিক্বাহে হানাফী'র মাসায়েল ঐ সকল কিতাবে ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত হয়েছে কি না? "জামাতে গোরাবায়ে আহলে হাদীসের" সাবেক ইমাম মাওলানা আবদুস্ সাত্তার সাহেব পিতা মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব সাহেবের ধর্মীয় অবদানসমূহ উল্লেখ করে লিখেছেন– "আপন যুগের ইমাম বুখারী স্বীয় উস্তাদ শায়খুল হিন্দ সাহেবের নিকট ইলম অর্জন করার পর ১৩ শ' হিজরীতে দিল্লী শহরে দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে কুরআন ও হাদীসের খালেস দরস দিতে থাকেন। এছাড়া অন্যান্য রৌদ্ধিক ও যৌক্তিক শাস্ত্র যথা মানতেক (যুক্তি) ফালসাফা (দর্শন) এবং প্রচলিত ফিক্বাহ প্রভৃতির গোমর ফাঁক করে দেন। কুরআন হাদীস থাকতে সেগুলোতে বিশ্বাস রাখা বা আমল করা অমার্জনীয় অপরাধ বলে প্রচার ও প্রসার চালান। তিনি আরও বলেছেন– প্রচলিত ফিক্বহী কিতাবপত্র ইসলামী শরীয়া'র সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কিতাব ও সুন্নাহ থাকতে সেগুলো মেনে চলা স্পষ্ট গোমরাহী এবং হারাম। আরে ভাই বলুন তো! হালাল খাদ্য থাকতে শুকর ভক্ষণ কেন জায়েয হবে?

(خطبہ امارت ص ۱۳۔ مسمولہ رسائل اہل حدیث ج ۲)

তিনি আরও লিখেছেন "তিনি শিরক ও বিদআতের মূলোৎপাটন করেন, দুরারোগ্য তাক্বলীদে শাখসীর গোমর ফাঁক করে দেন এবং ফিকাহ শাস্ত্রের গর্হিত ও নোংরা মাসায়েল যা সরাসরি কুরআন ও হাদীসবিরুদ্ধ সেগুলোকে ধুলিস্যাৎ করে ছাড়েন। (خطبہ امارت ص ۱۵)

লা-মাযহাবীদের প্রসিদ্ধ তার্কীক মৌলবী তালেবুর রহমান সাহেব লিখেছেন– "ফিকহে হানাফী (যাকে আপনাদের আলেম সমাজ এ দেশের সংবিধানরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন) এত নোংরা মাসায়েল দ্বারা ভরপুর যে কলম ও আমাদের মুখ তার ভার বহন করতে অক্ষম। তার সংরক্ষণ, লিপিবদ্ধকরণ ও মুখে উচ্চারণ কিছুই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, এটা তো সেই ফিকাহ যখন এটা মোস্তফা কামাল পাশার দেশে প্রচলিত ছিল, তখন তার পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এই ফিক্বহের মাসায়েল শুনে শুনে ইসলামের প্রতি তার ঘৃণা ধরে যায়। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ইসলামিয়াত বিভাগের এম, এ'র ছাত্রীরা এই ফিক্বহের গ্রহণযোগ্য কিতাব হিদায়া সম্পর্কে এই মত পোষণ করে যে, এরই নাম যদি ইসলাম হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সমাজতন্ত্রকেই গ্রহণ করব। (اصلی حنفی نماز ص ۳)

লা-মাযহাবীদের আরেকজন তর্কবিদ আবুল কালাম আশরাফ সালিম সাহেব ফিক্বহে হানাফির বিরুদ্ধে লেখা তার এক কিতাবের প্রাক কথনে লিখেছেন– "এই কিতাবে মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাদীসে কুফার হানাফি ফিক্বা'র ভিত্তিহীন আকায়েদ এবং লজ্জাকর মাসায়েলের জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণা সমৃদ্ধ পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। (احادیث نبویہ اور فقہ حنفیّہ ص ۳)) মৌলবী সাহেব উক্ত কিতাবে যে সব বেহুদা শিরোনাম দাঁড় করিয়ে সেগুলোর আবার টিকা টিপ্পনি এনেছেন তা বর্ণনাযোগ্য নয়।

(২) পেশাব-পায়খানায় কিবলামুখী হওয়া এবং পিঠ দেয়া উভয়টি নিষিদ্ধ

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

অর্থঃ হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– তোমাদের কেউ ইস্তিঞ্জা করতে

গেলে যেন কিবলার দিক মুখ বা পিঠ কোনটি না করে। উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা দু'টিই নাজায়েয। চাই তা দেয়াল বেষ্টিত স্থানে হোক বা খোলা ময়দানে। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত নিষেধবাণী ব্যাপকার্থজ্ঞাপক। তাতে কোন স্থানবিশেষকে পৃথক করা হয়নি। আল্লামা ইবনে কাইয়ূম (রহ.) লিখেছেন-

ومن خواصها اي الكعبة ايضا ان يحرم استقبالها و استدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الارض و اصح المذاهب في هذه المسئلة ان لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع (زاد المعاد في هدي خير العباد جـ١ صـ٨)

অর্থঃ বাইতুল্লাহ শরীফের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও একটি যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় তার দিকে মুখ বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন দু'টিই হারাম। দুনিয়ার আর কোন স্থানের সাথে এ হুকুম নেই। ফুকাহায়ে কেরামের নিকট বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী এক্ষেত্রে মুখ বা পৃষ্ঠপ্রদর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চাই তা উন্মুক্ত প্রান্তরে হোক বা প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে। এ মতের স্বপক্ষে দলীলের সংখ্যা দশের অধিক। যা আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি। কিন্তু বুখারী শরীফে বর্ণিত উক্ত কওলী হাদীসের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হলো প্রস্রাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ করা বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা বিলকুল জায়েয। না জায়েয হওয়া দূরের কথা মাকরূহই না; বরং তা সুন্নত। সুতরাং মাওলানা ইউনুস কুরাইশী সাহেব লিখেছেন– "কিন্তু ঘরে বা কোন কিছুর আড়ালে (কিবলামুখী হয়ে পেশাব- পায়খানা করা) জায়েয। (دستور المتقی ص ۴۵) আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন–

(ولا يكره الاستقبال والاستدبار للاستنجاء (نزل الابرار جـ١ صـ٥٢

অর্থঃ প্রস্রাব-পায়খানায় কিবলামুখী হওয়া বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা মাকরূহ নয়। মুফতী রশিদ আহমাদ-লুধিয়ানবী (রহ.) লিখেছেন– "আরেকটি মজার খবর শুনুন, ইস্তিঞ্জাখানায় কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এ কারণে সর্বাবস্থায় সতর্কতা

এর মধ্যেই যে, তা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু আহলে হাদীসদিগের নিকট অপরাপর মাজহাবের বিরোধিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হেতু করাচিতে তারা তাদের মসজিদের ইস্তিঞ্জাখানা ভেঙ্গে নতুনভাবে কিবলামুখী করে নির্মাণ করেছে। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তারা বলে- এ সুন্নত চৌদ্দশত বছর ধরে মুর্দা ছিল। একে যিন্দা করা হলো।

(احسن الفتاوي جـ٣ صـ١٠٩)

(৩) ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে মনি নাপাক

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারী (রহ.) একটি অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন-

باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره

অর্থাৎ মনি (বীর্য) ইত্যাদি ধৌত করার পর তার প্রভাব দূরীভূত না হলে। আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব এ অধ্যায়টির শিরোনামের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- ইমাম বুখারী (রহ.) এই অধ্যায়ে মনি ব্যতীত অন্য কোন নাপাকির কথা উল্লেখ করেননি। সম্ভবত তিনি সেগুলোকে মনির ওপর কিয়াস (অনুমান) করেছেন। যদ্বারা এই ফলাফল বের হয় যে, তাঁর নিকটও 'মনি' নাপাক। (তাইছিরুল বারী- ১৭০/১)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেবের এই বক্তব্য দ্বারা বোঝা গেল, ইমাম বুখারীর নিকট বীর্য নাপাক । কিন্তু লা-মাযহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মনি পাক। ফলে আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে লিখেছেন-

و المني طاهر سواء كان رطبا او يابسا مغلظا او غير مغلظ (كنز الحقائق صـ١٦)

অর্থঃ মনি পাক। চাই তা আর্দ্র হোক বা শুষ্ক, ঘন হোক বা অঘন। নবাব নুরুল হাসান সাহেব লিখেছেন- "মনি সর্বাবস্থায় পাক।" (عرف الحادي صـ١٠)

নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁন লিখেছেন- মানুষের মনি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল অবতীর্ণ হয়নি। (بدور الاهلة صـ١٥)

(৪) অল্প পানিতে নাপাকি পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) তার জামে' সহীহ'র প্রথম খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন- باب البول في الماء الدائم অর্থাৎ স্থির পানিতে প্রস্রাব করা। এ অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

অর্থঃ তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে যে এরপর তাতে আবার গোসল করায় লিপ্ত হবে। এই হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আবদ্ধ পানিতে নাপাকী পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়। চাই গুণত্রয়ের মধ্য হতে (গন্ধ, রং, স্বাদ) কোনটি পরিবর্তিত হোক বা না হোক। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করার কারণ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, এতে পানি নাপাক হয়ে যায়। আর এ কথা একেবারে স্পষ্ট যে, পানিতে পেশাব করলে না তার রং পরিবর্তিত হয়, না গন্ধ, না স্বাদ। কিন্তু বুখারী শরীফের এই হাদীসের বিপরীতে লা-মাযহাবীগণ বলেন- পানি ঐ সময় পর্যন্ত নাপাক হয় না যতক্ষণ না রং, স্বাদ, ও গন্ধ হতে কোন একটির মধ্যে পরিবর্তন আসে। চাই পানি বেশি হোক বা কম। সুতরাং নবাব নুরুল হাসান খাঁন লিখেছেন- "বৃষ্টি, নদী কূপের পানি পবিত্র এবং পবিত্রকারী। তা নাপাক হয় না। তবে যে নাপাকী দ্বারা তার রং বা স্বাদ অথবা গন্ধ রূপান্তরিত হয় এদ্বারা নাপাক হয়ে যায়। ((عرف الحادي صـ٩)

নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন-

لا يفسد ماء البئر و لو كان صغيرا و الماء فيه قليلا بوقوع نجاسة او موت حيوان دموي او غير دموي ولو انتفخ او تفسخ او تمعط بشرط ان لا يتغير احد اوصافه (نزل الابرار جـ١ صـ٣١)

http://asksumon.wordpress.com/main-page/

অর্থঃ কূপের পানি নাপাক হয় না। যদি তা ছোট হয় বা তাতে পানি অল্প হয়। কোন নাপাকি পতিত হওয়ার দ্বারা বা তাতে রক্তযুক্ত বা রক্তহীন প্রাণী মরে যাওয়ার দ্বারা। যদিও সে প্রাণী মরে গিয়ে ফুলে যায় বা ফেটে যায় অথবা তার লোম উপড়ে যায়। তবে শর্ত হলো, পানির গুণত্রয়ের মধ্য হতে কোনটি পরিবর্তিত না হওয়া।

(৫) ইমাম বুখারীর মতে গোসলে কুলি করা বা নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব নয়

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়ের নাম হলো- "باب المضمضة والا ستناق في الجنابة"

অর্থঃ জানাবতের গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া। এই শিরোনামের অধীনে আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো, জানাবতের গোসলে কুলি করা বা নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব নয়। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন তা ছিল ওজু পরিপূর্ণ করার জন্যে। আহলে হাদীস এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন- ওজু ও গোসল উভয়টিতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। হানাফী মাজহাবে ওজুতে সুন্নত এবং গোসলে ফরজ। (তাইছিরুল বারী- ১৮৮/১)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেবের বক্তব্য থেকে বুঝে আসে যে, ইমাম বুখারীর মতে গোসলে কুলি করা বা নাকে পানি দেয়া কোনটি ওয়াজিব নয়। অথচ লা মাযহাবীদের মতে উভয়টি ওয়াজিব।

(৬) ইমাম বুখারীর মতে অজুর অঙ্গগুলো একাদিক্রমে ধোয়া জরুরী নয়

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠার একটি বাব বা অধ্যায় এরূপ-

باب تفريق الغسل و الوضوء و يذكر عن ابن عمر ان غسل قدميه بعد ما جف

অর্থাৎ ওজুর অঙ্গসমূহ ধোয়ার ক্ষেত্রে মুআলাত তথা একাদিক্রম বজায় না রাখার বর্ণনা। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত

আছে, তিনি ওজুর অপরাপর অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পর দুই পা ধৌত করেছেন। এই অধ্যায়ের অধীনে ইমাম বুখারী নিম্নোক্ত মারফূ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه

عن عبد خير عن علي : أنه أتى بوضوء أو أتى بإناء فيه ماء فأفرغ على يديه من الإناء ، فغسلهما ثلاثا قبل أن يدخل يده في الإناء ، وأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق واستنثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ، فرفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة ، ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ، ثم غسلها بيده اليسرى ، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثلاث مرات ، ثم غسلها بيده اليسرى ، ثم قال : هذا طهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمن أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا طهوره.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মাইমুনা (রা.) বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে পানি রেখে দিলাম যা দিয়ে তিনি গোসল করবেন।

এরপর তিনি উভয় হাতে পানি ঢেলে দুইবার বা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাঁ হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। এরপর হাত মাটিতে ঘষলেন। এরপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর চেহারা ও উভয় হাত ধৌত করলেন। এরপর স্বীয় শরীর মোবারকে পানি ঢাললেন। এরপর সে স্থান থেকে সরে এসে উভয় পা ধৌত করলেন। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক দাঁড় করানো উক্ত অধ্যায় এবং সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, তার মতে ওজুর অঙ্গাদি ধৌত করার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা জায়েজ আছে। তাতে মুআলাত বজায় রাখা অর্থাৎ এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে অপর অঙ্গ ধৌত করা আবশ্যক নয়। সুতরাং এই অধ্যায়ের ফায়দায় আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "অর্থাৎ মুআলাত না করা। আবু হানিফা ও শাফেয়ী' (রহ.)-এর মতেও মুআলাত ওয়াজিব নয়। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভিমতও তাই। (تيسير الباري جـــ١ صـــ١٩٢) কিন্তু লা-মাজাহাবীগণ হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উক্ত অভিমত ও তার পেশকৃত মারফূ' হাদীসের সাথে একমত নন। তাদের মতে মুআলাত বর্জন করা বিদআত বলে গণ্য। যেমন, নবাব সিদ্দীক হাসান খান লিখেছেন- "ওজুতে মুআলাত বর্জন করা বিদআত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ওজুর পদ্ধতি বর্ণনাকারীদের থেকে মুআলাত বর্জনের কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজুর অঙ্গসমূহ একাদিক্রমে ধৌত করতেন। তিনি ওজুর অঙ্গাদি ধৌত করার মাঝে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হতেন না। সুতরাং ওজুর অঙ্গাদি ধৌত করার সময় মুআলাত বর্জনকরণ স্বয়ং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত বলে ঘোষণা প্রদান করে। এ কাজ বিদআত না হয়ে পারে না। আর হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর আমল দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য নয়। কেননা সাহাবায়ে কেরামের আমল দলীল হতে পারে না এমনকি তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত হলেও। লক্ষ্য করুন! ওজুতে মুআলাত আবশ্যক নয়। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) একটি অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন। অধিকন্তু এর সমর্থনে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমরের আমল এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মারফূ' হাদীস পেশ করেছেন। যদ্বারা হযরত ইবনে উমর এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ওজুতে

মুআলাত বর্জনকরণ বরং এক অঙ্গ হতে অপর অঙ্গ ধোয়ার মাঝে কালক্ষেপণ ও পার্থক্যকরণ প্রমাণিত হয়। কিন্তু লা-মাজাহাবী আলেম নবাব সাহেব বলছেন-

ওজুতে মুআলাত না করা বিদআত। (نقل کفر کفر نہ باشد)। তার কথার মর্ম তো এই দাঁড়ালো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইবনে উমর (রা.) দু'জনই বিদআত করেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)

این کار از توی آید مرداں چنیں کنند

নবাব সাহেবের এ কথাও অত্যন্ত চিন্তনীয় যে, সাহাবীগণের আমল শরীয়তের দলীল নয়। তা বিশুদ্ধ সনদেই বর্ণিত হোক না কেন।

(৭) ইমাম বুখারীর মতে নিছক সহবাসের ফলে গোসল ফরয হয় না

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় বীর্যপাত ব্যতীত নিছক সহবাসের কারণে গোসল ফরয হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করার পর স্বীয় মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন- قال ابو عبد الله الغسل احوط

অর্থঃ আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারীর) অভিমত হলো গোসল করায় অধিক সতর্কতা নিহিত। এর মর্ম হলো হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট কেবল সহবাসের কারণে গোসল ফরজ হয় না। তবে বীর্যপাত ঘটলে ফরজ হয়। কিন্তু সতর্কতাবশত গোসল করে নেয়া উচিৎ। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন-

وههنا مذهب اخر ذهب إليه طائفة من الصحابة و اختاره بعض اصحابنا كالامام البخاري وهو ان لا يجب الغسل بالايلاج فقط إذا لم ينزل عملا بحديث إنما الماء من الماء (نزل الابرار جـــ١ صـــ٢٣)

অর্থঃ এখানে আরেকটি মাজহাব আছে। যা গ্রহণ করেছেন সাহাবাদের একটি দল। এছাড়া আমাদেরও কতিপয় ইমাম যথা ইমাম বুখারী (রহ.)

এ মত পোষণ করেছেন। সে মাজহাবটি হলো, বীর্যপাত ব্যতীত নিছক সহবাসের দ্বারা গোসল ফরয হয় না। তারা "পানির কারণেই পানি ফরয হয়" শীর্ষক হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর মাজহাবের [8]বিপরীতে লা-মাযহাবীদের কথা হলো, নিছক সহবাসের দ্বারাই গোসল ফরয হয়ে যায়। চাই বীর্যপাত ঘটুক বা না ঘটুক। সুতরাং মরহুম নবাব নূরুল হাসান সাহেব লিখেছেন– কামভাবের সাথে বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়, চাই এ বীর্যপাত কেবল কাম-চিন্তার দরুনই হোক না কেন। এমনিভাবে নারী-পুরুষের উভয় লজ্জাস্থান মিলিত হলেও গোসল ফরয হয়। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। (عرف الجادي صـــ١٤)

'হাকিম সাদেক সিয়ালকোটি সাহেব লিখেছেন– সুতরাং মাসআলা এই প্রমাণিত হলো যে, নিছক যৌন মিলনের দ্বারাই পুরুষ ও মহিলা জুনুবী গণ্য হয়, তাদের ওপর গোসল ফরজ হয়। এক্ষেত্রে বীর্যপাত শর্ত নয়। (صلاة الرسول صـــ٦٣)

(৮) ইমাম বুখারীর মতে হায়েজা এবং জুনুবীর জন্যে কুরআন পাঠ করা জায়েয। ইমাম বুখারী জামে সহীহ'র ৪৪ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন এমন–

باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

অর্থাৎ হায়েজা ও জুনুবী এরা হজ্বের সব আমল করে যাবে, শুধু কাবা শরীফের তাওয়াফ করবে না। এই বাবের অধীনে ইমাম বুখারী (রহ.) সাহাবীদের অনেক আছার (বাণী ও আমল) উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জুনুবী এবং হায়েজার জন্যে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন– "আর ইমাম বুখারীর মাজহাব এই বোঝা যায় যে, জুনুবী এবং হায়েজা

---

[8] এ বিষয়ে ইমাম নববী বলেছেন–

وكانت جماعة من الصحابة على ان لا يجب الغسل إلا بالانزال ثم رجـــع بعضـــهم و انعقـد الاجماع بعد الاخرين ، شرح نووي جـــ١ صـــ١٥٥

উভয়ের জন্যে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয আছে। (تيسير البـــاري صـــ٢١٥)

এ থেকে জানা গেল যে, ইমাম বুখারীর মতে হায়েজা ও জুনুবী কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে। কিন্তু এ মতের বিরোধিতা করে লা-মাযহাবীগণ বলেন– হায়েজা ও জুনুবীর জন্যে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েজ নেই। সুতরাং নবাব নূরুল হাসান খান লিখেছেন– "জুনুবী এবং হায়েজার জন্যে মসজিদে আসা ও কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম, হালাল নয়। (عرف الجادي صـــ١٥)

হাকিম সাদেক সিয়ালকোটি সাহেব লিখেছেন- "জুনুবী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। জুনুবী ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। (صلاة الرسول صـــ٦٩)

তার কিতাবের একটু সামনে তিনি এই নামে অধ্যায় দাঁড় করেছেন যে, হায়েজার কুরআন পাঠ করা নিষেধ। এর অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন–

عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : " لَا تقْرَأ الْحَائض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن " رَوَاهُ ابْن ماجة ، وَالتِّرْمذيّ

অর্থঃ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- হায়েজা ও জুনুবী কুরআনের কোন অংশ তিলাওয়াত করবে না। (صلاة الرسول ص٧٤)

মাওলানা মুহিউদ্দীন সাহেব লিখেছেন- "জানাবতের অবস্থায় মসজিদে গমন করা জায়েয নেই এবং কুরআন তিলাওয়াত করাও নিষিদ্ধ। (فقہ محمدیہ ج ا ص ٣١)

প্রফেসর তালেবুর রহমানের ভাই ড. শফিকুর রহমান যায়দী লিখেছেন- "জানাবত এবং হায়েজ অবস্থায় কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত হারাম হওয়ার স্বপক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই। (তাই একে হারাম বলা যাবে না।) তবে এ দুই অবস্থায় তিলাওয়াত মাকরূহ অবশ্যই হবে। (نماز نبوی ص ٥٨)

(৯) মহিলাকে স্পর্শ করলে ওজু ভঙ্গ হয় না

ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের ৫৫ পৃষ্ঠায় নিমোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرِجْلاَىَ فِى قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

অর্থঃ নবী পত্নী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখভাগে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার পা জোড়া থাকত তার কিবলায়। তিনি সিজদায় গিয়ে আমার গায়ে ছোঁয়া লাগাতেন। এতে আমি আমার পা দু'টো গুটিয়ে নিতাম। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি আবার পা ছড়িয়ে দিতাম। আর সেই দিনগুলোতে ঘরে বাতিরও ব্যবস্থা ছিল না। বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীর গায়ে হাত লেগে গেলে ওজু ভঙ্গ হয় না। কেননা এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায়কালে স্বীয় হাত মোবারক দ্বারা আয়েশা (রা.)-এর পা স্পর্শ করতেন। এরপর তিনি নামাযে রত থাকতেন। যদি কোন নারীকে স্পর্শ করার কারণে ওজু ভঙ্গ হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন না। কারণ এমন করলে ওজু ভেঙ্গে যেত। আর ওজু ভেঙ্গে গেলে নামাজ ভেঙ্গে যেত এবং তা পুনরায় পড়তে হত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আয়েশা (রা.)কে হাতে স্পর্শ করার পরও নামাজ পড়তে থাকা একথার স্পষ্ট দলীল যে, কোন নারীকে স্পর্শ করা ওজু ভঙ্গের কারণ নয়। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন-

وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو اصابها بعض جسده (فتح البـــاري جـــ١ صـــ٣٥٢)

অর্থাৎ এই অধ্যায়ের শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, যদি পুরুষের দেহের কোন অংশ নারীর শরীরের কোন অংশের সাথে লেগে যায় তবুও নামাজ সহীহ হবে। কিন্তু লা-মাযহাবীগণ বুখারী শরীফের এই সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করে বলেন- কোন নারীকে স্পর্শ করলে ওজু ভেঙ্গে যায়। যেমন আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব-

باب قرائة القرآن بعد الحدث و غـــيره শিরোনামের অধ্যায়ের অধীনে লিখেছেন- "এখান থেকেই আলোচ্য অধ্যায়ের শিরোনাম বেরিয়ে আসে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজু ব্যতীত কুরআনের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেছেন। এখন কেউ আপত্তি করে বলতে পারে যে, ঘুমের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওজু তো ভঙ্গ হত না। ফলে তিনি যে বেওজু ছিলেন এটা প্রমাণিত হয় কী করে? এর উত্তর হলো যেহেতু তিনি ওজু করে নিয়েছিলেন, তাই স্পষ্টভাবে বোঝা গেল, ওজু ভেঙ্গে গিয়েছিলো। আরেক কথা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় স্ত্রীর সাথে শয়ন করেছিলেন। আর কোন নারীকে স্পর্শ করলে ওজু ভেঙ্গে যায়। (তাইসিরুল বারী- ১৪২/১)

হাফেজ আব্দুল্লাহ রৌপড়ী সাহেব এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন- এমনিভাবে উটের গোস্ত ভক্ষণ করলে বা বমি করলে বা নাকছির (নাক দিয়ে রক্ত বের) হলে বা কামভাবের সাথে লজ্জাস্থান কিংবা কোন নারীকে স্পর্শ করলে অথবা জানাজা কাঁধে নিলেও ওজু করে নেয়ার মধ্যে সতর্কতা রয়েছে। (ফাতাওয়া আহলে হাদিস- ২৮১/১)

(১০) জুতা পরিধান করে নামায পড়া

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এমন- بـــاب الصلاة في النعـــال অর্থাৎ জুতা পরিহিত অবস্থায় নামাজ পড়া। এই বাবের অধীনে হযরত ইমাম বুখারী নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى أَبُو مَسْلَمَةَ : سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : سَـــأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى فِى نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ.

অর্থঃ হযরত সায়ীদ বিন ইয়াযিদ আল-আযদী (রহ.) বলেন- আমি হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুতা পরিহিত অবস্থায় নামাজ পড়তেন? তিনি বললেন- হ্যাঁ। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "ইবনে বাত্তাল বলেছেন, জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামাজ পড়া জায়েয আছে। আর আমার মতে তা মুস্তাহাব। (তাইসিরুল বারী- ১৭৮/১)

আরেক স্থানে তিনি লিখেছেন-

ويسن ان يصلي في النعلين إذا كانا طاهرين و لو خلعهما و صلى بدونهما فلا بأس (نزل الابرار جـــ١ صـــ٦٨)

অর্থঃ জুতা পাক হলে তাসহ নামাজ পড়া সুন্নত। জুতা খুলে নামাজ পড়লেও কোন সমস্যা নেই। বুখারী শরীফের হাদীস শরীফ দ্বারা জানা যাচ্ছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতো সমেত নামাজ পড়েছেন। আর লা-মাযহাবীদের নামজাদা আলেম আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেবও একে সুন্নত ও মুস্তাহাব বলেছেন- কিন্তু বর্তমান যুগের কোন আহলে হাদীসের এর ওপর আমল নেই। আমি নিজেও কোন আহলে হাদীসকে এর ওপর আমল করতে দেখিনি।

(১১) ইমাম বুখারীর মতে উটের খামারে নামাজ পড়া বেলা কারাহাত জায়েয

বুখারী শরীফের ৬০ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় হলো, بـــاب الصـــلاة في مواضع الابل অর্থাৎ উটের খামারে নামাজ পড়া। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ (রহ.) উটের খামারে নামাজ পড়া মাকরূহ বলেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁদের অভিমতকে খণ্ডন করেছেন। (তাইসিরুল বারী- ৩০৭/১)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেবের উক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে উটের খামারে কারাহাত (মাকরূহ হওয়া) ব্যতীতই নামাজ পড়া জায়েয। অথচ এর বিরুদ্ধে আল্লামা সাহেবের অভিমত হলো, উটের খামারে নামাজ পড়া হারাম। শুধু হারামই নয় বরং

সে নামাজ পুনরায় পড়ে নেয়া আবশ্যক। তিনি লিখেছেন- "প্রকৃত মাসআলা হলো, উটের খামারে নামাজ পড়া হারাম। কেউ এমন করলে তাকে অবশ্যই নামাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। (তাইসিরুল বারী- ৩০৪/১)

(১২) মসজিদে মিহরাব ও মিম্বার

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.)- জামে সহীহ'র প্রথম খণ্ডের ৭১ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

অর্থঃ হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বলেন- মসজিদে নববীর কিবলা দিকস্থ দেয়াল ও মিম্বারের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, একটি বকরী যাতায়াত করতে পারত। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "হাদীস থেকে এই ফলাফলও বের হয় যে, মসজিদ মিহরাব ও মিম্বার বানানো সুন্নত নয়। মিহরাব তো একদম না থাকা উচিৎ। আর মিম্বার আলাদা কাঠের তৈরী করে রাখতে হবে। আমাদের যুগে এ আপদ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, প্রত্যেক মসজিদে মিম্বার ও মিহরাব ইট-চুনা দিয়ে তৈরী করা হয়। (তাইসিরুল বারী- ৩৪২/১)

বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা জানা গেল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বর্ণযুগে মসজিদে নববীতে মিহরাব ছিল না। আর আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেবের মতে মিহরাব বানানো সুন্নত নয়। মাওলানা আবদুস-সাত্তার সাহেব আরেকটু অগ্রসর হয়ে মত প্রকাশ করেন যে, মিহরাব বানানো বিদআত। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন- অবশ্যই মসজিদসমূহে প্রচলিত মিহরাব বানানো না-জায়েজ এবং বিদআত।

(فتاوي ستاريه جـــ١ صـــ٦٣)

কিন্তু বুখারী শরীফের হাদীস এবং লা-মাজহবীদের পূর্ববর্তী আকাবির আলেমদের মতের বিরুদ্ধে বর্তমান যুগের সকল লা-মাযহাবী মসজিদে এই বিদআত চালু রয়েছে এবং তাদের সকল মসজিদে মিম্বারের সাথে সাথে মিহরাবও চোখে পড়ে।

(১৩) ইমাম বুখারীর মতে 'সুতরা' সব জায়গায় জরুরী

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এরূপ باب السترة بمكة وغيرها

অর্থাৎ মক্কা শরীফ এবং অন্যান্য স্থানে (নামাজীর সামনে) সুতরা বা আড় কাঠি স্থাপনের বর্ণনা। এ বাবের অধীনে আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "এই বাব আনয়নের দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য, সকল স্থানে সুতরা স্থাপন করা আবশ্যক। এমনকি মক্কা শরীফেও। আর কতিপয় হাম্বলী আলেম বলেন, মক্কায় নামাজীর সম্মুখভাগ দিয়ে গমন করা জায়েয। শাফেয়ী হানাফীদের মতে সর্বত্র নাজায়েয। ইমাম বুখারীর অভিমতও তাই বোঝা যায়। আব্দুর রাজ্জাক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে 'সুতরা' ব্যতীত নামাজ পড়তেন। ইমাম বুখারী (রহ.) উক্ত হাদীসকে যয়ীফ মনে করেছেন। (তাইসিরুল বারী- ৩৪৪/১)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, ইমাম বুখারীর মতে সবখানে 'সুতরা' স্থাপন করা আবশ্যক। সুতরা ব্যতীত কোন মুসল্লির সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয হবে না। চাই তা মক্কা শরীফে হোক বা অন্য কোথাও। কিন্তু লা-মাযহাবীগণ ইমাম বুখারীর সাথে এ ব্যাপারে একমত নন। তাদের মতে মসজিদে হারাম, মক্কা মুকাররমায় 'সুতরা' ব্যতীত মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা যাবে। যেমন মাওলানা আব্দুল্লাহ রৌপড়ী সাহেব একটি সুওয়ালের জবাবে লিখেছেন- বাইতুল্লাহ শরীফে নামাজীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা জায়েয আছে। (ফাতাওয়া আহলে হাদিস-৪৫৭/১)

(১৪) উষ্ণ মৌসুমে জোহরের নামায কিছুটা ঠাণ্ডায় (বিলম্বে) পড়া সুন্নত

ইমাম বুখারী জামে সহীহ'র প্রথম খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এনেছেন- باب الابراد بالظهر في شدة الحر

অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমে জোহরের নামাজ কিছুটা ঠাণ্ডায় (রোদের তাপ কমে এলে) পড়ার বর্ণনা। অধ্যায়টির অধীনে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। এখানে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হলো।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتْ : رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ : نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ .

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- প্রচণ্ড গরমে তোমরা (জোহরের) নামাজ ঠাণ্ডা করে (একটু বিলম্বে, সূর্যের উত্তাপ হ্রাস পেলে) আদায় করো। কেননা, অত্যধিক গরম জাহান্নামের উত্তাপের ফল।

দুই.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التلول

অর্থ: হযরত আবু যর গেফারী (রা.) বলেন- হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াজ্জিন (হযরত বেলাল) জোহরের আযান দিতে শুরু করলেন। এতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (দুপুরের তাপ) ঠাণ্ডা হতে দাও, ঠাণ্ডা হতে দাও। অথবা বললেন, একটু বিলম্বে একটু বিলম্বে। তিনি আরও বলেন, প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। যখন (রোদের) তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, তখন নামাজ ঠাণ্ডা করে অর্থাৎ কিছুটা বিলম্বে আদায় করবে। শেষে (আমরা নামাজ এতটা বিলম্বে আদায় করলাম যে) টিলার ছায়া দেখতে পেলাম।

তিন.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- প্রচণ্ড গরমে তোমরা নামাজ ঠান্ডা করে পড়ো। কেননা, ভীষণ গরম জাহান্নামের উত্তাপের অংশ।

চার.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

অর্থ: হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা জোহরের নামাজ ঠাণ্ডা করে আদায় কর। কেননা, অত্যধিক গরম জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস চতুষ্টয় দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, উষ্ণ মৌসুমে জোহরের নামাজ বিলম্বে পড়া উচিৎ। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশও তাই। কিন্তু বুখারী শরীফের এই হাদীস চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীগণ বলেন– নামাজ সর্বাবস্থায় ওয়াক্তের শুরুতে পড়া উত্তম। সুতরাং তাদের নামজাদা আলেম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন- "নামাজ সর্বাবস্থায় আওয়াল ওয়াক্তে পড়া উত্তম"।

(فتاوي ثنائيه جـــ١ صـــ٥٥٣)

হাকিম সাদেক সিয়ালকোটী সাহেব স্বীয় কিতাবে নামাজ আওয়াল ওয়াক্তে পড়ার ব্যাপারে অতিশয় গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন- "আমাদের কর্তব্য হলো, নামাযগুলো যথার্থভাবে আদায় করার সাথে সাথে ওয়াক্তের প্রতিও লক্ষ্য রাখা। আর চেষ্টায় কোন ত্রুটি না করে নামাজগুলো আওয়াল ওয়াক্তে পড়তে হবে। (صلاة الرسول صـــ١٤٢٦)

(১৫) আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায পড়া নাজায়েজ

ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের ৮২ ও ৮৩ পৃষ্ঠায় ফজর ও আসরের পর নামাজ পড়ার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন–

এক.

عن ابي هريرة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– نهى عن بَيْعَتَيْنِ ، وعن لِبْسَتَيْن ، وعن صلاتين ، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ধরনের বেচা-কেনা, দুই ধরনের পরিচ্ছদ এবং দুই ধরনের নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি ফজরের (ফরজের) পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।

দুই.

عَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، قَالَ سَمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُول : " لَا صَلَاةَ بعد الصُّبْحِ حَتَّى ترْتَفِع الشَّمْس ، وَلَا صَلَاةَ بعد الْعَصْرِ حَتَّى تغرب الشَّمْس ".

অর্থ: হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন- ফজরের (ফরজের) পর কোন নামাজ নেই সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের (ফরজের) পর কোন নামাজ নেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'ধরনের নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। বুখারী শরীফের

পবিত্র এই হাদীসগুলো দ্বারা ছাবেত হলো, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামাজ জায়েয নেই। কেননা, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয়বিধ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন কিন্তু বুখারী শরীফের এই হাদীসগুলোর বিপরীতে লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হলো-এ দুই ওয়াক্তে তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাওয়াফের নফল এবং ফজরের সুন্নত পড়া জায়েয আছে। ফলে দেখা যায় যে, তারা ফজরের ফরজের পরপরই সুন্নত পড়ে নেয়।

নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন- "আর ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামাজ জায়েয নেই। তবে ফজরের দু'রাকাত সুন্নত পড়া জায়েয আছে। আর এমনই আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামাজ জায়েয নেই। তবে তাওয়াফের দুই রাকাত নফল নামাজ এ সময়ে জায়েয আছে। বরং তাওয়াফের এ দুই রাকাত নামাজ দিন ও রাতের যে কোন মুহূর্তে জায়েয আছে। (عرف الجادي صـــ١٨)

(১৬) ক্বাযা নামাজ আদায় করা জরুরী

ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এই শিরোনামে এনেছেন যে,

باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

অর্থাৎ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর ক্বাজা নামাজ জামাতের সহিত আদায় করা। এই বাবের অধীনে ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – : « وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا » . فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) খন্দক যুদ্ধের দিনে যখন খন্দকের খননকার্য চলছিল তিনি সূর্যাস্তের পর আগমন করলেন এবং কুরাইশবংশের কাফেরদের গালমন্দ করতে লাগলেন। এরপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসরের নামাজ পড়তেই পারলাম না, অথচ সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আল্লাহর কসম! আমিও আসর পড়িনি। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের জন্যে ওজু করলেন। আমরাও ওজু করলাম। এরপর সূর্যাস্তের পর তিনি আসর পড়লেন এবং মাগরিব পড়লেন তার পরে। এই হাদীসটিই ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের ৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন এবং যে অধ্যায়ের অধীনে উল্লেখ করেছেন তার নাম- باب قضاء الصلوات الاولى فـــالاولى অর্থাৎ একাধিক ক্বাজা নামাজ ধারাবাহিকভাবে আদায় করা। একই পৃষ্ঠায় আরেকটি বাবের শিরোনাম হলো- باب منسي صلوة فليصـــل إذا ذكـــر কোন নামাযের কথা ভুলে গেলে স্মরণ হতেই তা আদায় করে নেয়া। এর অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، لَاكَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذٰلِكَ إِنَّ اللّٰـــهَ عَـــزَّ وَجَلَّ قَالَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}[سورة طه آية ١٤].

অর্থ: কেউ কোন নামাযের কথা ভুলে গেলে স্মরণ হতেই তা আদায় করে নেবে। এছাড়া সে নামাযের আর কোন কাফফারা নেই।

(আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন) আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম কর। ইমাম বুখারী (রহ.) এর উল্লেখকৃত হাদীসগুলো দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে।

এক. যে নামাজ কাযা হয়ে যায়, চাই ইচ্ছা করেই হোক বা ভুলে গিয়ে বা ঘুমিয়ে থাকার কারণে তা আদায় করে নেয়া জরুরী। কেননা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে থাকায় বা ভুলে যাওয়ার কারণে যে নামাজ কাযা হয়ে যায় তা আদায় করে নিতে বলেছেন- এ কারণে সে নামাজ পড়ে নেয়া জরুরী হয়ে উঠেছে। এথেকেই বোঝা যায়

যে, এসব ওজর ব্যতীত যে নামাজ কাযা হয়ে যায় তা আদায় করে নেয়াও আবশ্যক। কেননা ওজরবশত ছুটে যাওয়া নামাজ যেহেতু আদায় করে নিতে হয়, সেহেতু ওজর ব্যতীত স্বেচ্ছায় কাযা করা নামাজও যে আদায় করতেই হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

দুই. যদি একাধিক নামাজ কাযা হয়ে যায়, তাহলে ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজগুলো আদায় করতে হবে। যেমন, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের নামাজ কাযা হলে তিনি নামাজগুলো আদায় করে নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম বুখারীর দাঁড় করানো অধ্যায়ের চাহিদাও তা-ই। কিন্তু উল্লিখিত হাদীসগুলোর বিপরীতে লা-মাযহাবীগণ বলেন- ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযা নেই। কেবল তাওবা ও ইসতেগফার করে নিলেই চলবে। সুতরাং মাওলানা মোহাম্মাদ ইউনুস দেহলবী লিখেছেন- "কেউ যদি ইচ্ছায়, জেনে-শুনে নামাজ ছেড়ে দেয়, আর সেই নামাজের কাযা আদায় করতে চায় তাহলে জানা উচিৎ যে, এধরনের নামাজের কাযা আদায়ের কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এক্ষেত্রে তাওবা, ইসতেগফার করাই যথেষ্ট। (دستور المتقي صــ١٤٩)

মাওলানা আব্দুল্লাহ রৌপড়ী সাহেব লিখেছেন- "বালেগ হওয়ার পর যদি কাযা নামাজের পরিমাণ অল্প হয় যা সহজে আদায়যোগ্য তাহলে তা আদায় করে নেবে। আর বহুদিনের কাযা নামাজ যা আদায় করে নেয়া দুষ্কর (তা আদায় করতে হবে না) বরং অবশিষ্ট জীবনের নামাজগুলোই যথেষ্ট হবে। (ফাতাওয়া আহলে হাদিস- ৪১৫)

জামাতে গোরাবায়ে আহলে হাদীসের সাবেক ইমাম মুফতি আবদুস-সাত্তার সাহেব লিখেছেন- "কিন্তু প্রশ্ন হলো, নামায কাযা হলো কী কারণে? এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কাযা করে থাকে তাহলে শরীয়তে এর না কাযা আদায়ের নির্দেশ আছে, না আছে এর অন্য কোন উপায়। ঘুমিয়ে পড়ার কারণে কোন নামাজ ছুটে গেলে যখন জেগে উঠবে তো সেটাই হবে তা আদায়ের সময়। ভুলে গেলে, স্মরণ হওয়ার কালটাই তা আদায়ের সময়। বেহুঁশ হলে যখন হুঁশ ফিরবে সেটাই তার ওয়াক্ত। এরপর আবার নামায কাযা হওয়ার অর্থ কী? প্রকৃতপক্ষে কুরিপুবশত কোন

ওজর বানিয়ে নিয়ে কেউ নামাজ কাযা করলে শাস্তিস্বরূপ সে কাফের হয়ে যায়। তাই সে তাওবা করে মুসলমান হবে।

(فتاوى ستاريه جــ٤ صــ١٥٤)

লা-মাযহাবীদের শায়খুল হাদীস নামাজ বর্জনের একাধিক পন্থা তুলে ধরে লিখেছেন- প্রথম পন্থা বিনা ওজরে, কুরিপু তাড়িত হয়ে নামাজ বর্জন করা। এটা ইচ্ছাকৃত নামাজ তরক করার মধ্যে শামিল, এর কোন কাযা নেই। বিষয়টি হাদীসের ভাষ্য من ترك الصلوة متعمـــدا (যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরক করে) এর মধ্যে গণ্য হবে। তওবায়ে নাসূহ তথা খাঁটি তওবা ব্যতীত এর কোন চিকিৎসা নেই। (رسول اکرم کی نماز ص۱۵۵)

(১৭) ইমাম বসে নামাজ পড়ালেও মুক্তাদিরা দাঁড়িয়ে পড়বে

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় দাঁড় করেছেন- باب حد المريض ان يشهد الجماعـــة অর্থাৎ কোন অবস্থা পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির জামাতে শরীক হওয়া উচিৎ। উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা হলো, মৃত্যু পূর্ববর্তী অসুস্থতায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা.) নামাজ পড়াচ্ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অসুস্থতায় কিছুটা চৈতন্য অনুভব করতে পেরে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে আসেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) পেছনে চলে আসেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামাজ পড়ান। আবু বকর (রা.) নামাজ দাঁড়িয়েই পড়েছিলেন। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম যদি ওজরবশত বসে নামাজ পড়ান তাহলে মুক্তাদীদের দাঁড়িয়েই পড়া কর্তব্য। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন-

واستدل به على صحة صلوة القادر على القيام قائما خلــف القاعــد

(فتح الباري جــ٢ صــ٢٠٦)

অর্থাৎ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, দাঁড়ানো মুসল্লির নামাজ উপবিষ্ট ইমামের পিছনে সহীহ হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী, তাবেয়ী,

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম বুখারীর অভিমতও এটাই। একটু সামনে ইমাম বুখারী (রহ.) আরেকটি অধ্যায় দাঁড় করেছেন- باب إنما جعل الإمام ليؤتم بـــه (অর্থাৎ ইমামকে এজন্যেই নিয়োগ করা হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে)। এর অধীনে তিনি হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত এমন দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন- যাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইমাম নামাজ বসে পড়ালে তোমরাও বসে পড়বে। বাহ্যত সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ এবং ইমাম বুখারীর মত হাদীস দু'টির বিপরীত মনে হচ্ছে। তাই ইমাম বুখারী (রহ.) এর জবাব স্বীয় উস্তাদ ইমাম হুমায়দীর প্রমুখাৎ লিখেছেন-

قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَـــعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًـــا فَصَـــلُّوا جُلُوسًـــا أَجْمَعُونَ * قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَـــلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْـــآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاري جـــ١ صـــ٩٦)

অর্থঃ আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম বুখারী) বলেন- "ইমাম হুমাইদী বলেছেন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ "ইমাম নামাজ বসে পড়লে তোমরাও বসে পড়বে" বলে যে নির্দেশটি তা পূর্ববর্তী কোন অসুস্থতাকালীন। এরপরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ বসে পড়িয়েছেন। অথচ তার পেছনে মুসল্লিগণ পড়েছেন দাঁড়িয়ে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বসতে আদেশ করেননি। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলসমূহের মধ্য হতে সর্বশেষটিকে গ্রহণ করা হয়। ইমাম বুখারী কর্তৃক স্বীয় উস্তাদের উল্লেখকৃত বাণী হতে বোঝা যায়, যে সব হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদীদেরকে বসতে আদেশ

করেছেন, সেগুলো ইমাম বুখারীর নিকট 'মানসূখ' এবং নবীজির মৃত্যু পূর্ববর্তী অসুস্থতাকালীন হাদীসটি 'নাসেখ' বলে গণ্য। এ কারণে যেটি নাসেখ তার ওপরই আমল করা উচিৎ। কিন্তু উক্ত হাদীস অনুযায়ী লা-মাযহাবীদের না আছে আমল না আছে ইমাম বুখারীর অভিমতের ওপর কোন শ্রদ্ধাবোধ। তাদের মনে সর্বাবস্থায় মাসআলা হলো- যদি ইমাম নামাজ বসে পড়ান তাহলে মুক্তাদীরাও বসেই পড়বেন। আল্লামা ওহীদুজ্জামান লিখেছেন- ইমাম আহমাদ এবং আহলে হাদীসের মাজহাব এটাই যে, ইমাম নামায বসে পড়লে মুক্তাদীরাও নামাজ বসেই পড়বে। (তাইসিরুল বারী- ৪৩৯/১)

(১৮) ইমাম বুখারীর মতে ইমামতির যোগ্য প্রথমত ঐ ব্যক্তি যিনি (اعلم) অর্থাৎ 'বড় আলেম'

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৯৩ নং পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় দাঁড় করেছেন-باب اهل العلم والفضل احق بالإمامة অর্থাৎ আলেম ও ফাযেলগণই ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য। এই অধ্যায়ে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)কে ইমাম নিয়োগকরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারীর মতে ইমামতির যোগ্য প্রথমত ঐ ব্যক্তি যে اعلـــم بالســـنة অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। ইমাম বুখারীর ইসতিদলালের ভিত্তি হলো, হযরত আবু বকর (রা.)কে ইমাম নিয়োগ সংক্রান্ত ঘটনাটি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মরযে ওফাতকালীন। ঐ সময়ে সবচেয়ে বড় কারী ছিলেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রা.) কে ইমামতি করতে বলেন। অথচ আবু বকর (রা.) খুব বড় কারী ছিলেন না। (উবাই বিন কা'বের তুলনায়) বরং اعلـــم ও افضل অর্থাৎ সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এবং সবচেয়ে বেশি সম্মানী ছিলেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামতের যোগ্য প্রথমত ঐ ব্যক্তি যিনি সর্বাধিক আলেম হবেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম বুখারী এবং সংখ্যাগুরু আলেম ওলামার মাজহাব

এটাই। কিন্তু বুখারী শরীফের এই পবিত্র হাদীসসমূহ এবং ইমাম বুখারীর অভিমতের বিরুদ্ধে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মাজহাব হলো, উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে (নির্দিষ্ট ইমাম না থাকলে) ইমামতের যোগ্যতম ব্যক্তি তিনিই গণ্য হবেন, যিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ কারী। সুতরাং আব্দুর রহমান মোবারকপুরী সাহেব লিখেছেন-

قلت القول الظاهر الراجح عندي هو تقدم الاقرأ على الافقه (تحفة الاحوذي جـ١ صـ١٩٧)

অর্থ: আমার নিকট সুস্পষ্ট ও সর্বাভিমত হলো, বড় আলেমের তুলনায় বড় কারীই ইমামতির অধিক হকদার।

নবাব নূরু হাসান খান লিখেছেন- "ইমামতে সর্বাগ্রগণ্য হলেন- সর্বশ্রেষ্ঠ কারী তার পড়ে সুন্নতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম।

(عرف الجادي صـ٣٦)

নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন-

واحقهم بالإمامة اقرأهم لكتاب الله فان استووا فاعلمهم بالسنة

অর্থঃ উপস্থিতির যোগ্যতম কারীই হবেন ইমামতের যোগ্যতম ব্যক্তি। আর কিরাআতে সকলে বরাবর হলে সুন্নতের যোগ্যতম আলেমকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(১৯) ইমামের উচিৎ সংক্ষিপ্ত ও হালকা (অনায়াসসাধ্য) নামাজ পড়ানো

প্রথম খণ্ডের ৯৭ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়-

باب تخفيف الامام في القيام و اتمام الركوع و السجود

অর্থাৎ ইমামের কিয়াম সংক্ষেপকরণ এবং রুকু-সিজদা পরিপূর্ণকরণ। এ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির খোলাসা হলো, হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন- এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরজ করে যে, আল্লাহর কসম! আমি অমুক ইমামের কারণে পিছে রয়ে যাই। কেননা, তিনি নামাজ খুবই দীর্ঘ করেন। হযরত আবু মাসউদ আনসারী বলেন-

আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াজ-নসিহত কালে সেদিনের চেয়ে অধিক রাগান্বিত আর কোন দিন দেখিনি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষের মনে ঘৃণা জাগিয়ে তোলে। তোমাদের কেউ যখন লোকদেরকে নামাজ পড়ায় তখন তার সংক্ষেপে পড়ানো উচিৎ। কেননা, নামাযীদের মধ্যে কেউ দুর্বল থাকে, কেউ বৃদ্ধ থাকে, কারও আবার থাকে প্রয়োজন। উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইমামকে নামাজ এভাবে পড়ানো উচিৎ যে, তা যেন হয় সংক্ষিপ্ত এবং অনায়াসসাধ্য। কিন্তু বুখারী শরীফের এই পবিত্র হাদীসের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীগণ এত লম্বা নামাজ পড়িয়ে থাকেন যে, তার কোন সীমা নেই। অতএব লা-মাযহাবীদের শায়খুল কুল মাওলানা মিয়াঁ নজির হুসাইন সাহেবের জীবনীকার ফযল হুসাইন বাহাজী মিয়াঁ সাহেবের পুত্র মিয়াঁ শরীফ হুসাইন সাহেবের বরাতে লিখেছে- "পাঞ্জেগানা নামাযের ইমামতি তিনিই অর্থাৎ মিয়াঁ নজীর হুসাইন সাহেব করতেন। তিনি নামাযে তা'দীলে আরকান এবং ইহসানের ধ্যানের প্রতি খেয়াল রাখতেন খুব বেশি। ফজরের নামায প্রায় ৪৫ মিনিটে এবং জোহরের নামাজ আধা ঘণ্টায় শেষ করতেন। রুকু-সিজদায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন। মিয়াঁ সাহেব প্রায়ই নিজের ব্যাপারে বলতেন- দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত আমার মত ইমাম নেই। (الحياة بعد الممات صـ٢٧٧)

উক্ত জীবনীকার মিয়াঁ সাহেবের মুজাহাদা ও সাধনা বিষয়ক আলোচনায় লিখেছেন- "মরহুম মাওলানা শরীফ হুসাইন সাহেবের ইমামতিতে কোন নামায আধা ঘণ্টার কমে শেষ হত না। যা স্বয়ং একটি কঠিন সাধনার নামান্তর। দিল্লীর গরম সম্পর্কে যারা অবগত আছেন তারাই এই মুজাহাদার আন্দাজ অনুমান করতে পারবেন। (الحياة بعد الممات صـ١٣٧)

(২০) নামাযে 'বিসমিল্লাহ' সর্বাবস্থায় আস্তে পড়া সুন্নত

১০২ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়- باب ما يقرأ بعد التكبير অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা'র পর যা পাঠ্য। উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহ. নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থঃ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) আল-হামদুলিল্লাহ (সূরা ফাতিহা) দ্বারা নামাজ শুরু করতেন। বুখারী শরীফের এই রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, নামাযে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ আস্তে বা নিচু আওয়াজে পড়তে হবে। কেননা হযরত আনাস (রা.) বলেছেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) নামাযে সর্বপ্রথম যা সরবে পাঠ করতেন তা হলো সূরা ফাতিহা। অন্যান্য আরও অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে ছানার পর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন। এমতাবস্থায় নামাযের ভেতরে সরব পাঠের সূচনা সূরা ফাতেহা দ্বারা করার অর্থ দাঁড়াবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ আস্তে বা নিচু আওয়াজে এবং সূরা ফাতিহা উঁচু আওয়াজে পাঠ করতেন। আর উঁচু আওয়াজে কিরাত পাঠের সূচনা সূরা ফাতিহা দ্বারাই হত। কিন্তু বুখারী শরীফের এই হাদীস এবং অন্যান্য আরও সহীহ হাদীসের বিপরীতে আহলে হাদীসগণ বলেন- জেহরী অর্থাৎ সরবে কিরাআত পাঠের নামাযে বিসমিল্লাহ সরবে পড়তে হবে। যেমন নবাব নূরুল হাসান খাঁন সাহেব লিখেছেন- "জেহরী নামাযে সরবে এবং সিররী নামাযে নীরবে (বিসমিল্লাহ) পাঠ করতে হবে।" (عرف الجادي صــ٣٦)

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস দেহলবী লিখেছেন- "জেহরী নামাযে (বিসমিল্লাহ) উঁচু আওয়াজে এবং সিররী নামাযে নিচু আওয়াজে পাঠ করা উত্তম। (دستور المتقي صــ٩٢)

(২১) ইমাম বুখারীর মতে সকল নামাজে ইমামের ন্যায় মুক্তাদীদের ওপরও কিরাআত ওয়াজিব

প্রথম খণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়-

وجوب القرائة للامام و المأموم في الصلوات كلــها في الحضـــر و السفر و يجهر فيها و يخافت

অর্থাৎ ইমাম-মুক্তাদী সকলের ওপর সমস্ত নামাযে কিরাআত পাঠ ওয়াজিব। চাই তা এলাকায় হোক বা ভ্রমণে, জেহরী নামাযে হোক বা সিররী নামাযে। উক্ত অধ্যায় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারীর মতে সমস্ত নামাযে ইমামের ন্যায় মুক্তাদীর ওপরও কিরাআত ওয়াজিব। যার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, ইমামের জন্যে যেরূপ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করা ওয়াজিব, অনুরূপ মুক্তাদীর জন্যেও সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করা ওয়াজিব। নতুবা ইমাম বুখারী (রহ.) অধ্যায় দাঁড় করাতেন এভাবে-

باب وجوب الفاتحة للامام والمأموم

অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের বর্ণনা। কিন্তু আহলে হাদীসগণ ইমাম বুখারী কর্তৃক উক্ত দাঁড় করানো অধ্যায়ের বিপরীতে বলেন যে, মুক্তাদীর ওপর শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। অন্য কোন সূরা পাঠ করা ওয়াজিব নয়। যেমন- আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "আহলে হাদীসগণ বলেন- নিঃসন্দেহে মুক্তাদীর জন্যে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন সূরা পাঠ করা আবশ্যক নয়। (তাইসিরুল বারী- ৪৯৭)

(২২) ফরজের শেষ দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে

প্রথম খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় হল-

باب يقرأ في الاخرين بفاتحة الكتاب

অর্থাৎ ফরজের শেষ দুই রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠের বর্ণনা। এই বাবের অধীনে ইমাম বুখারী রহ. নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

অর্থঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাযে প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অপর দুই সূরা পড়তেন। আর শেষ দুই রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন। বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়তে হবে। আর শেষ দুই বা এক রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন। কিন্তু লা-মাযহাবীগণ উক্ত স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদীস এবং আরও বহু হাদীসের বিপরীতে বক্তব্য প্রদান করেন যে, শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা পড়ারও অবকাশ আছে। যেমন আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন-

يجوز للرجل ان يقرأ بعد الفاتحة السورة في الاخرين أيضا من الصلوة الرباعية.(نزل الابرار جـــ١ صـــ٧٨)

অর্থঃ চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাযের শেষ দুই রাকাতে কোন ব্যক্তি সূরা ফাতিহার সাথে অপর কোন সূরাও পড়তে পারবে।

(২৩) সূরা ফাতিহা না পড়লেও মুক্তাদীর নামায হয়ে যায় এবং রুকু পেলে রাকাতও পাওয়া হয়

প্রথম খণ্ডের ১০৮ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এরকম باب إذا ركـــع دون الصـــف অর্থাৎ নামাযের কাতারে পৌঁছার পূর্বে রুকু করা। উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহ. নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

أن أبي بكرة : " أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرصا ، ولا تعد ".

অর্থ: হযরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেখেন তিনি রুকুতে। অতঃপর আবু বাকরাহ (রা.) কাতার পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই রুকুতে চলে যান। বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি বললেন, নেক কাজে আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। কিন্তু এমনটি পুনরায় করো না। বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে। যা নিম্নরূপ- এক. মুক্তাদীর নামায সূরা ফাতিহা পাঠ করা ব্যতিরেকে হয়ে যায়।

দুই. ইমামকে রুকুতে পাওয়া গেলে তৎসংশ্লিষ্ট রাকাতও পাওয়া হয়। উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনায় হযরত আবু বাকরাহ (রা.) সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত না করেই রুকুতে চলে গিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবগত করা হলে, তিনি আবু বাকরাহ (রা.)-এর আগ্রহ তো ঠিকই বৃদ্ধি করলেন কিন্তু তাকে নামাযটি পুনরায় পড়তে বলেননি। যদ্বারা বোঝা যায় তাঁর নামায হয়ে গিয়েছিলো। যদি তার নামায না হতো তাহলে তিনি তাকে নামাজ পুনরায় আদায় করতে বলতেন। কিন্তু বুখারী শরীফের এই স্পষ্ট হাদীসের বিপরীতে লা-মাযহাবীগণ বলেন– সূরা ফাতিহা পাঠ করা ব্যতীত মুক্তাদীর নামায হয় না। আর রুকুতে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট রাকাতও পায় না। তাকে সে রাকাত পুনরায় পড়তে হবে। যেমন মাওলানা আব্দুর রহমান গোরখপুরী লিখেছেন- রুকুতে শরীক ব্যক্তির রাকাত হয় না। কেননা প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। (فتاوي نذيريه جـــ١ صـــ٤٩٦)

নবাব নুরুল হাসান লিখেছেন– সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজ বিশুদ্ধ হয় না এবং কেবল রুকুতে অংশগ্রহণকারীর রাকাত গ্রহণযোগ্য নয়। (عرف الجادي صـــ٢٦)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন–

ولو وجد الإمام في الركوع لا يعتد بتلك الركعة لان قرائـة الفاتـحـة فرض عندنا

অর্থঃ ইমামকে নিছক রুকুতে পেলে সংশ্লিষ্ট রাকাতটি হিসাবে আসবে না। কেননা, আমাদের মতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। (نزل الابرار ص—١٣٣)

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস দেহলবী লিখেছেন- নিছক রুকুধারীর নামায কিছুতেই ধর্তব্য নয়। (دستور المتقي ص—١١١)

এখানেই শেষ নয়। এখানে লা-মাযহাবী তো চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই মর্মে ফতোয়া দিয়ে ফেলেছেন যে, যারা বলে রুকুধারীর রাকাত গ্রহণযোগ্য তাদের مخلد في النـار অর্থাৎ অনন্তকাল জাহান্নামে সাজা ভোগ করতে হবে। সুতরাং ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা সরফরায খাঁন (রহ.) احسـن الكـلام নামক কিতাবে একজন আহলে হাদীস তবে সুস্থ বিবেকধারী আলেমের প্রমুখাৎ উল্লেখ করেছেন যে- "আমাদেরই আহলে হাদীস ওলামার সংগঠন থেকে একজন আলেমের এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। তাতে তিনি রুকুধারীর রাকাত ধর্তব্য বলে উক্তিকারীদের ওপর চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার বিধান আরোপিত হবে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তার যুক্তি হলো নিছক রুকুধারীর সূরা ফাতিহা ছুটে যায়। সুতরাং তার নামাজ হয় না। যার নামাজ হয় না সে বে-নামাজী। বে-নামাজী কাফের। আর কাফের অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

اتمام الركوع في ادراك الركوع ص—١ بحوالة احسن الكلام جـ—١ ص—٥٥

(২৪) ইমাম বুখারীর মতে জুমার দিন গোসল ওয়াজিব নয়

প্রথম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় باب فضل الغسل نوم الجمعة অর্থাৎ জুমার দিন গোসল করার ফযীলত। ইমাম বুখারী (রহ.) জুমার দিন গোসল করার যে অধ্যায় দাঁড় করেছেন, তার থেকে বুঝে আসে যে, জুমার

দিন গোসল করা ফযীলত, আজর ও ছাওয়াব লাভের কারণ। কিন্তু ওয়াজিব নয়। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) উক্ত অধ্যায়ের শিরোনামের অধীনে লিখেছেন–

قال الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه الخلاف ، واقتصـر على الفضل لان معناه الترغيب فيه هو القدر الذي تقف الادلة على ثبوته

(فتح الباري جـ—٢ ص—٣٥٧)

অর্থঃ যাইন ইবনুল মুনীর বলেছেন- ইমাম বুখারী (রহ.) জুমার দিন গোসল করার হুকুম বর্ণনা করেননি। (যে তা নফল না সুন্নত না ওয়াজিব) কেননা, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। বরং ইমাম বুখারী অধ্যায়টির শিরোনামে কেবল 'ফযল' (ফযীলত) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- উৎসাহিতকরণ। এটাই সে স্তর যা ছাবেত হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত দলীল বিরোধমুক্ত। আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব এই বাবে'র অধীনে লিখেছেন, এবং ইমাম বুখারী সামনের হাদীস দ্বারা জুমার গোসল সুন্নত প্রমাণ করেছেন। (তাইসিরুল বারী- ১/১)

ইমাম বুখারীর ন্যায় মাজহাব চতুষ্টয়ের ইমাম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কেরামের অভিমতও তাই। অর্থাৎ জুমার দিন গোসল করা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম বুখারী এবং ফুকাহায়ে কেরামের অভিমতের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীদের মতে জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব। যেমন নবাব নুরুল হাসান খাঁন লিখেছেন– "জুমার জন্যে গোসল করা ওয়াজিব।"

(عرف الجادي ص—١٤)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন– ولمن يريد ان يصلي الجمعة واجب (نزل الابرار جـ—١ ص—٢٥)

অর্থঃ জুমার নামাজ পড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে গোসল করা ওয়াজিব। তিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন- "কোন ওজর না থাকার শর্তে আহলে হাদীস এবং জাহেরী আলেমগণের মতে জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব। (তাইসিরুল বারী- ২/২)

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস কুরাইশী লিখেছেন- "জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব। (دستور المتقي صــ٥٧)

(২৫) জুমার ওয়াক্ত সূর্য ঢলে যাবার পর

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠায় এই অধ্যায়টি দাঁড় করেছেন-

باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذالك يذكر عن عمــر و علي و النعمان بن بشير و عمرو بن حريث

অর্থাৎ জুমার ওয়াক্ত দ্বিপ্রহরে সূর্য ঢলে যাবার পর। হযরত উমর, আলী, নু'মান বিন বাশীর এবং আমর বিন হুরাইস (রা.) এই অভিমত পোষণ করেছেন। এই বাবের অধীনে ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

অর্থঃ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে যাবার পর জুমার নামাজ আদায় করতেন। হযরত ইমাম বুখারীর দাঁড় করানো এ অধ্যায় এবং তৎসংশ্লিষ্ট শিরোনাম দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জুমার ওয়াক্ত দ্বিপ্রহরে সূর্য ঢলে যাবার পর শুরু হয়। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

جزم بهذه المسئلة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنــده (فتح الباري جـــ١ صـــ٣٨٧)

অর্থঃ আলোচ্য মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় অভিমতকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন। কারণ, তার মতে বিরোধীদলের দলীলটি দুর্বল। নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন-

"ইমাম বুখারী (রহ.) সেই মাজহাবই গ্রহণ করেছেন যা জুমহুর (সংখ্যাগুরু ফুকাহায়ে কেরাম) গ্রহণ করেছেন যে, জুমার ওয়াক্ত দ্বিপ্রহরে সূর্য ঢলে যাবার পর শুরু হয়। (তাইসিরুল বারী- ১২/১)

কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দাঁড় করানো অধ্যায় তার মাজহাব ও অভিমত এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাদীসকে বাদ দিয়ে লা-মাযহাবীদের মতে জুমা দ্বিপ্রহরের পূর্বেও পড়া যায়। আর লা-মাযহাবীদের মুখপাত্র ও ফকীহ নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব বলেন- জুমার ওয়াক্ত সূর্য (পূর্ব দিগন্তে) এক বল্লম পরিমাণ উঁচুতে উঠলেই শুরু হয়ে যায়। সুতরাং নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁন লিখেছেন-

وقد ورد ما يدل على انها تجزئ قبل الزوال (الروضة الندية جـــ١ صـــ١٣٧)

অর্থঃ হাদিসে এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যদ্বারা বোঝা যায় যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বেও জুমার নামাজ জায়েয। (একটু সামনে অগ্রসর হয়ে নিজেদের পছন্দনীয় মতকে তিনি যথার্থ বলেছেন)। নবাব নুরুল হাসান সাহেব লিখেছেন- "জোহরের ওয়াক্তই জুমার ওয়াক্ত। তবে জুমার নামাজ দ্বিপ্রহরের পূর্বেও জায়েয।

(النهج المقبول في شرائع الرسول صـــ٢٨)

নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- ووقتها من حين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى انتهاء وقت الظهر (نزل الابرار جـــ١ صـــ١٥٢)

অর্থঃ জুমার ওয়াক্ত সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উঁচু হওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। আরও জানতে হলে পাঠ করুন- فتاوي اهل حديث ، جـــ٢ صـــ٢٢

(২৬) জুমার উভয় আযান সুন্নত

প্রথম খণ্ডের ১২৫ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এরূপ- باب التـــأذين عنـــد الخطـــبة। অর্থাৎ খুৎবার পূর্বে আযান দেয়া। উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

অর্থঃ ইমাম যুহরী বলেন- আমি সায়েব বিন ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে জুমার প্রথম আযান ইমাম মিম্বারে আরোহণ করার পর দেয়া হত। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসল্লী সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে তিনি তৃতীয়[৫] আরেকটি আযান দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং, তা যাওরার[৬] ওপর দেয়া হলো, অতঃপর তা একটি পৃথক সুন্নতে পরিণত হল। বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে জুমার আযান একটিই ছিল, যা ইমামের সামনে মিম্বারের নিকট দেয়া হত। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফত অমলে যখন মুসল্লি সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল তখন তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আরেকটি আযানের প্রচলন ঘটে। উক্ত আযান হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উপস্থিতিতে দেয়া হত। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ-ই এতে আপত্তি করেননি। সুতরাং আযানটি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রবর্তিত হয়। কোন ইমাম, ফকিহ ও মুজতাহিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেননি। আর তা সম্ভবই বা কী করে? যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে শক্তভাবে ধারণ কর। এ আযান যেহেতু খলিফায়ে রাশেদ হযরত উসমান গণী (রা.)-এর নির্দেশে প্রবর্তিত হয়েছে, তাই এটি তাঁর সুন্নত।

---

[৫] দুটি আযান এবং একটি ইকামত মিলে তিন আযান।

[৬] মসজিদে নববী সংলগ্ন বাজারের উচ্চতম স্থান।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মোতাবেক তদনুযায়ী আমল করা জরুরী। প্রথমে এ আযান যাওরায় দেয়া হত। পরে মসজিদের ভেতরে দেয়ার প্রচলন ঘটে। আজও ইসলামী দেশগুলোতে আযানটি মসজিদ অভ্যন্তরেই দেয়া হচ্ছে। যারা হজ্ব পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তারা স্বচক্ষে দেখেছেন যে, আযানটি মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীর অভ্যন্তর ভাগেই প্রদান করা হয়। আল-হামদুলিল্লাহ! লেখক স্বচক্ষে বিষয়টি অবলোকন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আলোচ্য আযানটি মসজিদের ভেতরে দেয়ার ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু পবিত্র হাদীস, ইজমা, এবং উম্মতের মধ্যে পরম্পরাগতভাবে চলে আসা একটি আমলের বিরুদ্ধে যারা বিশ রাকাত তারাবী নামাজকে বিদআত বলতেন, তারা উক্ত আযান কেও বিদআত বলে ঘোষণা করেছেন। লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হলো, আযানটি যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছাবেত নেই, তাই এটি সুন্নত হতে পারে না। উক্ত কারণে তারা এ আযান প্রদান করেন না। বরং এ আযান মসজিদের ভেতরে দেয়া বিদআত সাব্যস্ত করে তা হতে বাধা প্রদান করেন। সুতরাং মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী লিখেছেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরে খলীফাদের যুগে তো দ্বিতীয় আযানের কোন অস্তিত্বই ছিল না। হ্যাঁ, হযরত উসমানের যুগে তা প্রবর্তিত হয়। যা সময় জানার জন্যে বাজারের উচ্চতম স্থানে প্রদান করা হত। কোন মসজিদের ভেতরে দেয়া হত না। সুতরাং আমাদের যুগে মসজিদে যে দু'টি আযান হয় তা স্পষ্ট বিদআত এবং কোন অবস্থায় জায়েয নয়। (فتاوي ستاريه جـ ٣ صـ ٨٥)

যুবাইদিয়া মাদ্রাসার মুদাররিস মাওলানা উবাদুল্লাহ সাহেব লিখেছেন- "জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদের ভেতরে একটা আযানই শরীয়তসম্মত। হযরত উসমান (রা.) যে আযান প্রবর্তন করেছেন তা মসজিদের বাইরে দেয়া হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং (মসজিদের ভেতরের) আযান পর্যন্তই আমাদের দায়িত্ব সীমিত করা উচিৎ। অপর আযানটি না দেয়া কর্তব্য। (فتاوي ستاريه جـ ٣ صـ ٨٥)

মাদরাসায়ে মিয়াঁ সাহেব দেহলবীর মুদাররিস মাওলানা আব্দুর রহমান লিখেছেন- "বর্তমানে প্রচলিত মসজিদে দুই আযান দেয়া বিদআত। (فتاوي ستاريه جــ٣ صــ٨٧)

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মুখপাত্র الاعتصــام পত্রিকার একটি ফতোয়া দেখে নিন। "জুমার দিন খুৎবার প্রাককালে একটি আযান দেয়া সুন্নত। দু'টি আযান দেয়ার প্রয়োজন নেই। ... তাই আযানে উসমানী যাকে প্রথম আযান বলা হয়। মসজিদের ভেতরে দেয়া বিদআত"। (فتاوي علماء حديث جــ٢ صــ١٧٩)

আবু মুহাম্মাদ মায়ানওয়ালী লিখেছেন-

"হানাফী এবং আহলে হাদীস মসজিদসমূহে দু'টি করে আযান দেয়া হত, যার প্রচলন হানাফী মসজিদগুলোতে এখনও আছে। মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব সাহেব জুমার খুৎবার আধ বা এক ঘণ্টা আগে দেয়া প্রথম আযানকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে বিদআত সাব্যস্ত করেছেন এবং তা বর্জনীয় বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, খুৎবাদানের উদ্দেশ্যে ইমামের মিম্বরে আসন গ্রহণকালীন দেয়া আযানটিই কেবল সঠিক। বর্তমানে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মসজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত সুন্নত আমল করা হচ্ছে- (مجموعہ رسائل مکمل نماز و ہدایت النبی ص ۲۱)

নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত সুন্নত অনুযায়ী আহলে হাদীস সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ আমল করেন না। যেখানেই যাবেন কেবল সুন্নতে উসমানীর রেওয়াজ চোখে পড়বে। (তাইসিরুল বারী-২১/২)

প্রফেসর তালেবুর রহমানের ভাই ড. শফিকুর রহমান লিখেছেন- "মসজিদের ভেতরে খুৎবার প্রাক্কালে প্রদেয় আযানটি শুধু আমলযোগ্য। অধিকাংশ মসজিদে এর পূর্বে যে আযানটি দেয়া হয়, হযরত উসমানের (রা.) যুগেও তার প্রমাণ মেলে না। এ কারণে তা বর্জন করা উচিৎ। (نماز نبوی ص ۲۵۸)

(২৭) বেতের, তাহাজ্জুদ, নফল সব পৃথক পৃথক নামায

প্রথম খণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় ابواب الوتر বেতের নামাযের বর্ণনা। উক্ত শিরোনামের অধীনে আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন-

ولم يتعرض البخاري لحكمه لكن افرده بترجمة عن ابـــواب التهجــــد و التطوع يقتضى ان غير ملحق بها عنده (فتح الباري جــ٢ صــ٤٧٨)

অর্থঃ ইমাম বুখারী (রহ.) বেতের নামাযের হুকুম বর্ণনা করেননি। (যে তা ওয়াজিব না সুন্নত)। কিন্তু তাহাজ্জুদ ও নফল থেকে পৃথকভাবে বেতেরের অধ্যায় দাঁড় করেছেন এ কারণে বোঝা যায় যে, তার মতে বেতের নামাজ তাহাজ্জুদ ও নফলের সাথে মিলিত নয়। (বরং প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন নামাজ)। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.)-এর উক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বেতের এবং নফল নামাজের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উপর্যুক্ত অভিমতের বিপরীতে লা-মাযহাবীদের মতে তারাবী তাহাজ্জুদ এবং বেতের সব অভিন্ন নামাজ। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "সঠিক কথা হলো, তারাবী, তাহাজ্জুদ, বেতের এবং সালাতুল-লাইল এগুলো সব অভিন্ন নামাজ। (تيسر الباري جــ٢ صــ٧٧)

(২৮) বেতের নামাজে দোআয়ে কুনূত রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পড়া উচিৎ

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ : قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ : قَبْلَهُ. قُلْتُ : إِنْ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ : كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، أُنَّهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَتَلَهُمْ قَوْمٌ مُشْــرِكُون

دُونَ أُولَئِكَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَهْدٌ ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

অর্থ: হযরত আসেম বলেন- আমি হযরত আনাস (রা.)কে কুনূত ও বেতের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কুনূত তো পড়া হতই। আমি আরজ করলাম, রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন, রুকুর আগে। আসেম বলেন- অমুক ব্যক্তি আপনার বরাতে আমাকে জানিয়েছে যে, আপনি নাকি রুকুর পরে কুনূত পাঠের কথা বলেন? হযরত আনাস বললেন- সে মিথ্যে বলেছে। তবে হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পর কুনূত পাঠ করেছেন, যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আর তার বৃত্তান্ত এরূপ যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুশরিক গোত্রের নিকট প্রায় সত্তর জনের একটি জামাত প্রেরণ করেন, যাদেরকে কারী বলা হত। উক্ত মুশরিক দলটি ছিল সেই মুশরিকদের থেকে আলাদা যাদের ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের মধ্যে সন্ধি হয়েছিল। (তারা সন্ধি ভঙ্গ করে)। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে কুনূত পাঠ করে তাদের জন্যে বদদোআ করেছিলেন। এই হাদীসটিই ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৮৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত রূপে উল্লেখ করেছেন-

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنْ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ

অর্থ: আবদুল আজিজ বলেন- জনৈক ব্যক্তি হযরত আনাস (রা.)কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তা রুকুর পরে পাঠ্য নাকি কিরাআত শেষে? হযরত আনাস বললেন- না, বরং কিরাআত শেষে। বুখারী শরীফের উক্ত হাদীস দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বেতের নামাযে দোআ কুনূত রুকুর পূর্বে পাঠ করতে হবে। কিন্তু বুখারী শরীফের হাদীস দু'টির বিপরীতে লা-মাযহাবীদের মতে বেতের নামাযে দোআ কুনূত রুকুর পরে পাঠ করা মুস্তাহাব এবং পছন্দনীয়। সুতরাং "আখবারে আহলে হাদীস দিল্লীর মুফতী একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন- "সহীহ হাদীস দ্বারা

স্পষ্টভাবে হাত উঠিয়ে বা বেঁধে কুনূত পাঠের প্রমাণ মেলে না। দোআ হওয়ার কারণে তা হাত উঠিয়ে পাঠ করা উত্তম। রুকুর পরে পাঠ করা মুস্তাহাব। বুখারী শরীফে রুকুর পরে পাঠ করার কথা আছে। রুকুর পূর্বে পড়ে নেয়াও জায়েয। কেননা, রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠেরও কতিপয় রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। হাত উত্তোলন করে আবার তা বেঁধে পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (ফাতাওয়া আহলে হাদিস- ২০৫/৩)

মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহ.) লিখেছেন-

يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع و بعده و المختار عندي بعد الركوع (تحفة الاحوذي جـ١ صـ٢٤٣)

অর্থ: বেতের নামাযে রুকুর পূর্বেও এবং পরেও কুনূত পাঠ করা জায়েয আছে। আমার মতে রুকুর পরে পাঠ করাই উত্তম। মাওলানা আব্দুল্লাহ রৌপড়ী লিখেছেন- "আর একইভাবে রুকুর পূর্বে কুনূত সাবেত করা এবং কেবল তদনুসারেই আমল করা, এটাও ঠিক নয়। কেননা, রুকুর পূর্বের ও পরের উভয় ধরনের বর্ণনাই পাওয়া যায়। সুতরাং আমল উভয়টা অনুযায়ী হওয়া উচিৎ।(ফাতাওয়া আহলে হাদিস- ২৩২/১)

আহলে হাদীসের মিথ্যেবাদিতা

ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস নামক কিতাবে যে বলা হয়েছে- "বুখারী শরীফে রুকুর পরে মর্মে রেওয়ায়েত আছে" তাহা মিথ্যা কথা। বুখারী শরীফে দোআ কুনূত রুকুর পরে পাঠ্য মর্মে কোন রেওয়ায়েত নেই, পারলে তারা পেশ করুন। আমরাও দেখে নিতে পারব।

সাদেক সিয়ালকোটি সাহেবের ধোঁকা ও খিয়ানত

হাকীম সাদেক সিয়ালকোটি সাহেব 'কুনূত রুকুর পরে পাঠ্য' মর্মে মাজহাব প্রমাণ করার লক্ষ্যে সীমাহীন ধোঁকাবাজী এবং খিয়ানতের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি এক তো স্বীয় কিতাব সালাতুর রাসূল-এর ৩৫৯-৬০ পৃষ্ঠার টিকায় নাসায়ী এবং আবু দাউদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা তিনি স্ব-ধারণা মতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হাদীস দু'টিতে যেহেতু কুনূত রুকুর পরে পাঠ্য মর্মে কথিত হয়েছে। তাই

বেতের নামাযে দোআ কুনূত রুকুর পরে পাঠ করা উচিৎ। আমি হাদীস দু'টি দেখেছি। সেগুলোর সম্পর্ক বেতের নামাযের কুনূতের সাথে নয় বরং কুনূতে নাযিলার সাথে যা ফজর নামাযে উঁচু আওয়াজে পাঠ করা হয়। হাকিম সাদেক সাহেব কুনূতে নাযিলার হাদীসকে কুনূতে বেতের বলে চালিয়ে দিয়ে স্বীয় মাজহাব প্রমাণ করার অপচেষ্টায় ধোঁকার আশ্রয় নিয়েছেন। এবং আল্লাহ ও রাসূলের বাণী বিকৃত করার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন–

ومحل القنوت بعد رفع الرأس في الركوع في الركعة الاخيرة (صلوة الرسول ص ٣٦٠ صحيح مسلم)

অর্থ: রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করার পর দোআ কুনূত পাঠ করতে হবে। (সহীহ মুসলিম) উক্ত উদ্ধৃতির মাঝে হাকিম সাহেব এই খেয়ানত করেছেন যে, হাদীসটির শুরু ভাগের সেই অংশের পুরোটাই ছেড়ে দিয়েছেন– যেই অংশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, হাদীসটি কুনূতে নাযিলা বিষয়ক। এর সম্পর্ক কুনূতে বেতেরের সাথে নয়। শরহে মুসলিম থেকে আমি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের পুরো শিরোনামটি তুলে ধরছি। যাতে পাঠকবর্গের সামনে হাকিম সাহেবের খিয়ানত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লামা নববী (রহ.) লিখেছেন-

باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة و العياذ بالله واستحباب في الصبح دائما و بيان ان محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الاخيرة واستحباب الجهربه (مسلم ج ١ ص ٢٣٧)

নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব শিরোনামটির তরজমা করেছেন এভাবে "অধ্যায়ঃ মুসলমানদের ওপর কোন বিপদ অবতীর্ণ হলে প্রতি ওয়াক্ত নামাযে উচ্চ স্বরে কুনূত পাঠ করা এবং আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা মুস্তাহাব এবং তা শেষ রাকাতে রুকু হতে মস্তক উত্তোলন করার পর পাঠ করতে হয়। আর ফজরের নামাজে কুনূত নিয়মিত পাঠ করা মুস্তাহাব।

এখন স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে যে, অধ্যায়টির সম্পর্ক কুনূতে নাযেলার সাথে কুনূতে বেতেরের সাথে নয়। কিন্তু যেহেতু শিরোনামটির কারণে সাদেক সিয়ালকোটী সাহেবের মাজহাবের মুখে ধুলো পড়ে, তাই শিরোনামটি তিনি পুরোপুরি উল্লেখ করেননি।

(২৩) কসরের দূরত্ব-৪৮ মাইল

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠা একটি অধ্যায় হলো–

باب فيكم تقصر الصلوة و سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما و ليلة و كان ابن عمر و ابن عباس يقصران و يفطران في اربعة برد و هو ستة عشر فرسخا

অর্থ: কতটা দূরত্বে গিয়ে নামাজ কসর করা উচিৎ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক রাতের দূরত্বকেও সফরের দূরত্ব বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস চার বারীদের দূরত্ব অতিক্রম করে নামায কসর করতেন এবং রোজা ভঙ্গ করতেন। আর চার বারীদ হলো ষোল ফারসাক তথা ৪৮ মাইল। (আল্লামা ওহীদুজ্জামানের উর্দু অনুবাদের ভাষান্তর) ইমাম বুখারীর দাঁড় করা উক্ত অধ্যায় দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কসরের দূরত্ব হলো, ৪৮ মাইল। কেননা চার বারীদে ষোল ফারসাখ হয়। এক ফারসাখে তিন মাইল। সুতরাং ষোল ফারসাখে হলো ৪৮ মাইল। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কায়েমকৃত বাবের বিপরীতে কতিপয় আহলে হাদীস তো কসরের জন্যে কোন দূরত্বই স্বীকার করেন না। কিছু বলেন- নয় মাইল আর কতিপয়ের মতে তিন মাইল। যেমন আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মাজহাব হলো প্রত্যেক সফরে নামায কসর করা উচিৎ। ওরফ বা লোকাচারে যা সফর হিসেবে গণ্য তার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। (তাইসিরুল বারী-১৩২/২)
মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন- "যে ব্যক্তি নিজ এলাকা থেকে বের হয়ে অপর কোন লোকালয়ে গমন করে, তাকে মুসাফির বলে।

হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক মুসাফির হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ তিন মাইলের পথ। (فتاوي ثنائيه جـــ١ صـــ٦٣٠)

জামাতে গোরাবায়ে আহলে হাদীসের মুফতী আবদুস সাত্তার সাহেব লিখেছেন- "তিন বা নয় মাইল পথ অতিক্রম করে নামাজ কসর করা যেতে পারে। (ফাতাওয়া সাত্তারিয়া-৫৭/৩)

মাওলানা ইসমাঈল সালাফী লিখেছেন- "কিন্তু বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী নয় মাইলের পর কসর করা সঠিক। (রাসূলে আকরাম কী নামায-১০৬)

(৩০) মাগরিবের নামাজের পূর্বে নফল পড়া সুন্নত নয়

বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় হলো- بـــاب الصلوة قبل المغرب অর্থাৎ মাগরিবের নামাজের পূর্বে নফল পড়ার বর্ণনা। উক্ত অধ্যায়ে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন-

এক.

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه –صلى الله عليه وسلم– :صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা বলেন- আব্দুল্লাহ মুযানী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা মাগরিবের পূর্বে নামাজ পড়ো। তৃতীয়বারে বলেছেন- যার ইচ্ছা (সে পড়ে নিতে পারে) এই বিষয়টিকে অপছন্দ করে যে, এটিকে লোকেরা সুন্নত বানিয়ে নিবে।

দুই.

مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَـــى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ

অর্থ: মারছাদ বিন আব্দুল্লাহ ইয়াযানী বলেন- আমি হযরত উকবা বিন আমের (রা.)-এর নিকট এসে বললাম, আমি কি আপনাকে হযরত আবু

তামীমের একটি বিস্ময়কর কাজের কথা শোনাব? তিনি মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়েন। হযরত উকবা বলেন- আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তা করতাম। আমি আরজ করলাম, এখন বাধাটা কোথায়? তিনি বললেন, ব্যস্ততা। বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীস দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ সুন্নত নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তা সুন্নত জ্ঞানে আদায় করাকে মাকরূহ জেনেছেন- প্রথম হাদীস হতে যা স্পষ্টভাবেই বুঝে এসেছে। দ্বিতীয় কথা হলো, শুরুতে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত নফল পড়তেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা একেবারে বর্জনীয় হয়ে ওঠে। যা দ্বিতীয় হাদীসের ভাষ্যে সুস্পষ্ট। এ থেকেও বোঝা যায় যে, এটি নফল, সুন্নত নয়। নতুবা সাহাবাদের পক্ষে অসম্ভব যে, তারা পার্থিব কোন ব্যস্ততার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সুন্নতকে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের বিপরীতে আহলে হাদীসদের মতে মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকাত পড়ে নেয়া সুন্নত। শুধু তাই নয়, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী উক্ত দুই রাকাতকে সুন্নতরূপে অস্বীকারকারী জালিম এবং বিদআতী। যেমন- মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী লিখেছেন- মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত পড়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যা আযান এবং ইক্বামাতের মাঝে পড়া উচিৎ। ...মাগরিবের আযান শেষ হওয়ামাত্র দুরূদ পড়ে আযানের দোআ পড়া উচিৎ। এরপর সুন্নত শুরু করতে হবে। আর এ সুন্নতটি ফজরের সুন্নতের ন্যায় দ্রুত পড়ে নেয়া কর্তব্য। (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে আহলে হাদিস-২৩২/৪)

দিল্লীর দারুল হাদীস রহমানী মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব লিখেছেন– মাগরিবের পূর্বের সুন্নত পড়তে যে বাধা দেয় বা তাকে সুন্নত জ্ঞান করে না সে জালেম এবং বিদআতী। (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে আহলে হাদিস-২৩৫/৪)

(৩১) হযরত আয়েশার আট রাকাতওয়ালা হাদীস এবং লা-মাযহাবীদের তদনুযায়ী আমল

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان و غيره

অর্থাৎ রমজান এবং অরমজানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতের নামাজ। উক্ত অধ্যায়ে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ يَعْنِى زَوْجَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم– كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فِى رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ ، وَلاَ فِى غَيْرِ رَمَضَانَ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ :« يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِى »

অর্থ: আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেছেন যে, রমজান মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাজ কেমন হত? হযরত আয়েশা বলেছেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান এবং অরমজানে এগার রাকাতের অধিক পড়তেন না। তিনি চার রাকাত পড়তেন। তুমি জান না যে, তা কতটা মনোহর এবং কতটা দীর্ঘ হত। এরপর আবার তিনি চার রাকাত আদায় করতেন। তুমি জান না যে, তা কী মনোহর এবং কতটা দীর্ঘ হত। এরপরে তিনি পড়তেন তিন রাকাত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেতের আদায়ের পূর্বে কি ঘুমিয়ে পড়েন? তিনি ফরমান, হে আয়েশা! আমার চোখ ঘুমিয়ে পড়ে। অন্তর জেগে থাকে। আহলে হাদীসগণ 'তারাবী' আট রাকাত প্রমাণ করার জন্যে হযরত আয়েশা বর্ণিত, উপর্যুক্ত হাদীসটি অত্যন্ত দাপটের সাথে পেশ

করে থাকেন। আর বিশ রাকাত 'তারাবী'র যাবতীয় হাদীস এবং আ-ছার কে উপর্যুক্ত হাদীসবিরুদ্ধ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথমত হাদীসটির সম্পর্ক তাহাজ্জুদের সাথে। তারাবী'র সাথে নয়। যার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। (বিস্তারিত জানতে লেখকের "হাদিস আওর আহলে হাদিস" নামক কিতাবটি দ্রষ্টব্য।) দ্বিতীয়ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে বোঝা যায় যে, আহলে হাদীসগণ নিজেরাই উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করেন না। আমল করা তো দূরের কথা তারা সরাসরি হাদীসটির বিরোধিতা করেন। তার কারণগুলো নিম্নরূপ-

এক. হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাজ চার চার রাকাত করে পড়তেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ পড়েন দুই দুই রাকাত।

দুই. হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাজ একাকী পড়তেন। কেননা, এতে নবীজির নামাজ পড়ার কথা আছে পড়ানোর উল্লেখ নেই। কিন্তু আহলে হাদীসগণ পুরো রমজান মাস এ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন।

তিন. হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাজ ঘরে পড়তেন। কেননা, হাদীসটিতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বেতের আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আমার চক্ষু ঘুমায় অন্তর জেগে থাকে। স্পষ্ট কথা যে, উক্ত প্রশ্নোত্তর গৃহাভ্যন্তরেই সম্ভব। কেননা, মদীনায় অবস্থানকালে তিনি কোন বিবির হুজরাতেই ঘুমাতেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ এ নামাজ সারা রমজান ঘরে না পড়ে মসজিদে পড়ে থাকেন।

চার. হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘুম থেকে জেগে বেতের আদায় করতেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ তারাবী'র পর সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ার আগেই বেতের আদায় করেন।

পাঁচ. হাদীসটি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের একাকী আদায় করতেন। পক্ষান্তরে আহলে হাদীসগণ আদায় করেন জামাতের সাথে।

ছয়. হাদীসটি দ্বারা প্রামাণিত হচ্ছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বছর তিন রাকাত বেতের নামাজ এক সালামের সহিত আদায় করতেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ অধিকাংশ সময় এক রাকাত বেতের পড়েন। আর কখনও তিন রাকাত পড়লেও দুই সালামের সহিত পড়ে থাকেন।

(৩২) ইমাম বুখারীর মতে জানাজার নামাজে মাইয়েত পুরুষ হোক বা মহিলা, ইমাম তার কোমর বরাবর দাঁড়াবে

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডে ১৭৭ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়-

باب اين يقوم من المرأة والرجل

অর্থাৎ ইমাম পুরুষ বা মহিলা মাইয়েতের কোন জায়গা বরাবর দাঁড়াবে? এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন-

لهذا اورد المصنف الترجمة مورد السوال و اراد عدم التفرقة بين الرجل و المرأة (فتح الباري جـ٣ صـ٢٠١)

অর্থ: একারণে ইমাম বুখারী (রহ.) আলোচ্য শিরোনামটি প্রশ্ন আকারে উল্লেখ করেছেন- এবং একথা বলতে চেয়েছেন যে, উক্ত মাসআলায় পুরুষ ও মহিলা মাইয়েতের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। (অর্থাৎ মাইয়েত পুরুষ হোক বা মহিলা ইমাম তার কোমর বরাবর দাঁড়াবে)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "ইমাম বুখারীর মতে মাইয়েত পুরুষ হোক বা মহিলা ইমাম তার কোমর বরাবর দাঁড়াবে। (তাইসিরুল বারী- ২৯২/২)

আল্লামা ইবনে হাজার এবং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেবের লিখিত বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আলোচ্য মাসআলায় পুরুষ ও মহিলা মাইয়েতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জানাজা পুরুষের হোক বা মহিলার উভয় অবস্থায় ইমাম মাইয়েতের কোমর বরাবর দাঁড়াবে। কিন্তু ইমাম বুখারীর বর্ণিত অভিমতের বিপরীতে আহলে হাদীসদের মাজহাব হলো, উক্ত মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। জানাজা পুরুষের হলে ইমাম তার মাথা বরাবর দাঁড়াবে। আর মহিলার হলে দাঁড়াবে কোমর বরাবর। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন–

সুন্নত এটাই যে, ইমাম মহিলা মাইয়েতের কোমর বরাবর আর পুরুষ মাইয়েতের মাথা বরাবর দাঁড়াবে। (তাইসিরুল বারী- ২৯১/২)

"ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে হাদীসে" এক প্রশ্নের উত্তরে লেখা হয়েছে- মাইয়েত যদি পুরুষ হয়, তাহলে ইমাম তার মাথা বরাবর দাঁড়াবে। আর যদি মহিলা হয়, তাহলে তার কোমর সোজা দাঁড়াবে। (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে আহলে হাদিস-২০৮/৪)

আরেকটু সামনে লেখা হয়েছে- "মাইয়েত পুরুষ হলে তার মাথা বরাবর দাঁড়ানো মুস্তাহাব। আর মহিলা হলে তার কোমর বরাবর দাঁড়ানো সুন্নত। (ফাতাওয়ায়ে উলামায়ে আহলে হাদিস-২১২/৫)

(৩৩) মৃতরা শুনতে পায়

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়-

باب الميت يسمع خفق النعال

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি প্রত্যাগমনকারীদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পারে। উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ . يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولاَنِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ – يَعْنِى مُحَمَّدًا – –صلى الله عليه وسلم–

অর্থঃ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে শায়িত করা হয় এবং কবরস্থানে আগত ব্যক্তিরা প্রত্যাগমন করে এমনকি মৃতব্যক্তি তাদের জুতোর আওয়াজও শুনতে পায় তখন দু'জন ফেরেস্তা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং জিজ্ঞেস করে, এই যে মুহাম্মাদ লোকটি (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী?

বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় আল্লামা ওহীদুজ্জামান লিখেছেন– "অধ্যায়টির শিরোনাম রচয়িতা (ইমাম বুখারী রহ.) বলেন, উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তি শুনতে পারে এবং এটাই আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মাজহাব।" (তাইসিরুল বারী- ২৯৫/২)

কিন্তু বর্তমান যামানার আহলে হাদীস আলেম "সিমায়ে মাওতা" তথা মৃতেরা শুনতে পায় মর্মে যে প্রসিদ্ধ অভিমত রয়েছে তার ঘোর বিরোধী। সুতরাং একজন আহলে হাদীস আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী লিখেছেন- "সিমায়ে মাওতার" মাসআলা কবরের আযাব কিংবা রুহের হাকিকতের ন্যায় নিছক একটি গবেষণামূলক বিষয়ই নয়, বরং তা শিরকের সবচেয়ে বড় চওড়া দরজা। অতএব কারণে কুরআন "সিমায়ে মাওতার" সকল সম্ভাব্য পথ পরিপূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

(روح عذاب قبر اور سماع موتی ص ۴۲)

জনৈক গায়রে মুকাল্লিদ আলেম প্রফেসর আব্দুল্লাহ ভাওয়ালপুরী সাহেব মাসআলায়ে সিমায়ে মাওতা নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন- তাতে "মৃতেরা শুনতে পারে কিনা" শীর্ষক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন- "আরে ভাই! এও কি মাসআলা হলো? এটি তো সচক্ষে দর্শনের বিষয়। আপনি কোন মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলে দেখুন। তাহলেই জানতে পারবেন সে শোনে কিনা। সে শুনতেই যদি পারে, তাহলে মুর্দা হতে যাবে কেন? শুনতে পারা তো যিন্দা লোকের কাজ। এ কাজ তো কোন মুর্দার নয়। সে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেয় এবং 'বরযখের' জীবনে চলে যায়। এই দুনিয়ার বিচারে সে মৃত। যার না আছে শোনার ক্ষমতা, আর না আছে বলার শক্তি। (রাসায়েলে বাহাওয়াল পুরী-৩৪)

(৩৪) ইমাম বুখারীর মতে মুশরিকদের নাবালক সন্তান জান্নাতী

-বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৮৫ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় হলো

باب ما قيل في اولاد المشركين

অর্থাৎ মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তার বর্ণনা। শিরোনামটির ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন-

هذه الترجمة تشعر أيضا بان كان متوقفا في ذلك و قد جزم بعد هـذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى انهم في الجنـة كما سيأتي تحريره (فتح الباري جـ٢ ـ٢٤٦)

অর্থ: উক্ত শিরোনাম থেকে বোঝা যায়, ইমাম বুখারী (রহ.) আলোচ্য মাসআলায় কোন পক্ষ অবলম্বন করেননি। কিন্তু অন্যত্র সূরা 'রূমের' তাফসীরে তিনি যেভাবে দৃঢ়তার সাথে বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তা হতে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারী'র মতে মুশারিকদের নাবালক সন্তানেরা জান্নাতী। এবিষয়ে সামনে লেখা আসবে। আল্লামা ইবনে হাজারের উক্ত লেখা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর নিকট মুশরিকদের নাবালক সন্তান জান্নাতী মর্মে উক্তিটিই পছন্দনীয়। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "মুমিনগণের নাবালক সন্তানেরা তো বেহেশতী; কিন্তু কাফেরদের যেসব সন্তান নাবালক অবস্থায় মারা যায়, তাদের ব্যাপারে মতবিরোধের অন্ত নেই। ইমাম বুখারীর অভিমত হলো তারা বেহেশতী। কেননা, গুনাহ ব্যতীত আযাব হতে পারে না। আর তারা নিষ্পাপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (তাইসিরুল বারী- ৩৩০/২)

তিনি আরও লিখেছেন- "উক্ত হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় মাজহাব প্রমাণিত করেছেন। আর তা এভাবে যে, সকল শিশুই যেহেতু ইসলামী ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে, সেহেতু যদি সে শৈশবকালেই মারা যায়, তাহলে তার মৃত্যু মুসলিম হিসেবেই হবে। আর কেউ মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতী হবে। তাইসিরুল বারী- ৩৩১/২)

কিন্তু বুখারী (রহ.)-এর মাজহাব ও মতের বিপরীতে লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হলো, হয়ত তাদেরকে দোযখী বলতে হবে অথবা চুপ করে থাকতে হবে। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব - باب إذا اسلم الصبي فمــات (নাবালক ইসলাম গ্রহণেরপর মারা গেলে) অধ্যায়টির আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন- "উল্লিখিত হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত হলো যে, কোন শিশু কাফের অবস্থায় মারা গেলে সেও তার কাফের পিতা-মাতার সাথে জাহান্নামী হবে। (তাইসিরুল বারী- ৩১০/২)

নবাব সিদ্দীক হাসান সাহেব আলোচ্য মাসআলায় তাওয়াক্কুফের পন্থা অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ কাফেরদের নাবালক সন্তান মারা গেলে জান্নাতী হবে না জাহান্নামী হবে এ আলোচনায় কালক্ষেপণ না করে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। (السراج الوهاج جـ٢ ـ٦١٢)

(৩৫) ইমাম বুখারীর মতে মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েয নেই

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়-

باب فرض مواقيت الحج و العمرة

অর্থাৎ হজ্ব ও উমরার মীকাতের বর্ণনা। উক্ত অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন-

وهو ظاهر نص المصنف وان لا يجيز الاحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات (فتح الباري جـ٣ صـ٣٨٢)

অর্থ: ইমাম বুখারীর বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মতে মীকাতের পূর্বে হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধা জায়েয নেই। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা গেল যে, ইমাম বুখারীর মতে মীকাতের পূর্বে হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধা না-জায়েয। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "সম্ভবত ইমাম বুখারীর মাজহাব হলো, মীকাতে পৌছার পূর্বে ইহরাম বাঁধা ঠিক নয়। (তাইসিরুল বারী- ২৩৮/২)

কিন্তু লা-মাযহাবীদের মতে মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েয। যেমন নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁন লিখেছেন-

ويجوز الاحرام بالحج بما فوق الميقات ابعد من مكة سواء دويرة اهله و غيرها ، و من الميقات افضل (السراج الوهاد جـ١ صـ٤٠٥)

অর্থ: হজ্বের ইহরাম মীকাতের পূর্বে বাঁধাও জায়েয। চাই মক্কা থেকে বহুদূরে নিজের বাড়ি থেকে বাঁধুক বা অন্য কোন স্থান থেকে। তবে মীকাত থেকে বাঁধা উত্তম।

(৩৬) ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা জায়েয

বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ২৪৮ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়- باب تزويج المحرم অর্থাৎ 'মুহরিমের বিয়ের বর্ণনা। উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হযরত মাইমুনা (রা.)কে বিয়ে করেছেন- বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৬৬ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারী (রহ.) আরেকটি অধ্যায় দাঁড় করেছেন- باب نكاح المحرم। অর্থাৎ মুহরিম ব্যক্তির বিয়ে করা। উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

انبئنا بن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم

অর্থঃ আমাদের নিকট ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন। ইমাম বুখারী কর্তৃক দাঁড়কৃত উভয় অধ্যায় এবং বর্ণিত হাদীস দু'টি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মুহরিম ব্যক্তি ইহরামের অবস্থায় বিয়ে করতে পারে। ইমাম বুখারীর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বোঝা যায় স্বয়ং তাঁর মতেও ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা জায়েয। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বর্ণিত দ্বিতীয় অধ্যায়টির ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

كان يحتج إلى الجواز لانه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث ابن عباس في ذلك و لم يخرج حديث المنع كانه لم يصح عنده على شرطه (فتح الباري جـ٩ صـ١٦٥)

অর্থ: এমন মনে হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) (উক্ত হাদীস দ্বারা) বিয়ে জায়েয মর্মে ইসতিদলাল করেছেন। কেননা, তিনি অধ্যায়টিতে ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস ব্যতীত আর কিছু বর্ণনা করেননি। আর তা নিষেধ মর্মেও কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। যেন নিষিদ্ধতাজ্ঞাপক হাদীসটি তাঁর শর্তানুযায়ী সহীহ নয়। আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- সম্ভবত ইমাম বুখারী (রহ.) উক্ত মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা এবং আহলে কুফার সাথে মতৈক্য পোষণ করেছেন যে, মুহরিম ব্যক্তির বিয়ে করা জায়েয। (তাইসিরুল বারী- ৪২/৩) (تيسير الباري جـ٣ صـ٤٢)

কিন্তু এই স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদীস এবং ইমাম বুখারীর মতের বিপরীতে আহলে হাদীসদের মাজহাব হলো, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা জায়েয নেই। সুতরাং মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী সাহেব লিখেছেন- وهو قول الجمهور و ا لراجح عندي অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা জায়েয নেই। এবং এটাই আমার মতে সর্বাগ্রগণ্য মাজহাব। (تحفة الاحوذي جـ ٢ صـ ٨٨) নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁন এবং মাওলানা শামছুল হক সাহেবও উক্ত মতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। (السراج الوهاج جـ ٢ و عون المعبود جـ ٢)

(৩৭) হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে এবং বাসরকালীন বয়স

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় সায়্যিদা আয়েশা (রা.)-এর বয়স বিয়ের সময় ছয় বছর এবং বাসরকালে এগার বছর উল্লেখ করেছেন- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি নিম্নের হাদীস দু'টি বর্ণনা করেছেন-

এক.

عن عائشة قالت: تزوّجني النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا بنتُ ستّ سنين،

অর্থ: হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার ছয় বছর বয়সকালে বিয়ে করেছেন।

দুই.

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

অর্থ: হিশাম তার পিতা থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনা গমনের তিন বছর

পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তেকাল করেন। এরপর দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময় (বিপত্নিক থেকে) আয়েশা (রা.)কে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন। আর তার নয় বছর বয়সে নিজ গৃহে তুলে নেন। বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীস দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিয়ের সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিল ছয় বছর এবং রুখসতীর সময় ছিল নয় বছর। কিন্তু বুখারী শরীফের এই উভয় হাদীসের বিপরীতে লা-মাযহাবীদের বিরল-দৃষ্টান্ত গবেষক আলেম হাকিম ফয়েজ আলম সাহেবের গবেষণার তেলেসমাতী কী তা লক্ষ্য করুন। তিনি লিখেছেন- "এখন এক দিকে বুখারী শরীফের নয় বছর বয়সী রেওয়ায়েত আর অপর দিকে এত শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে, যদ্বারা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় যে, নয় বছরের রেওয়ায়েতটি একটি মওজু ও জাল বর্ণনা। যেটাকে আমরা সাহাবীদের অসতর্ক উক্তি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। আর সাহাবীদের এমন একটা উক্তি এত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, বর্তমানে কোন ইলম ও ফজলের বিশিষ্ট দাবীদারের সামনে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট কোন হাদীস বর্ণনা করা হলে তাদের জবাব মেলে তোমার বিচার শক্তি লোপ পেয়েছে। (صديقه كائنات صـ ٨٠)

তিনি আরও লিখেছেন- "আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই দীর্ঘতায় ভীত হয়ে উক্ত বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া একটি অনেক বড় দ্বীনি খিয়ানত। ভাষা দৃষ্টির অধিকারীগণকে খানিক এদিকে মনোযোগী হতে বলি, যদি কেউ তাদেরকে বলে তোমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল ছয় বছর বয়সে এবং তাকে তুলে নেয়া হয়েছিল নয় বছর বয়সে। তা-ও আবার দীর্ঘ অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভের দিন কয়েক পর, যে সময়টাতে তার মাথার চুলগুলোও যথারীতি গজায়নি। তখন তার অবস্থা কী দাঁড়াবে? উপরন্তু যদি এ ঘটনার প্রচার-প্রসার শুরু হয়ে যায়, তখন কি তার মুখ দেখাবার কোন স্থান থাকবে? কিন্তু এই সব কিছু খাতামুল মা'সূমীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা এবং তার পূণ্যাত্মা স্ত্রীর ব্যাপারে গর্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হায়রে বিস্ময়! (صديقه كائنات صـ ٨٢)

(৩৮) ইমাম বুখারীর মতে খন্দক যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীতে

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৮৮ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়- باب غزوة الخندق অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধের বর্ণনা। এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) মুসা বিন উকবার নিম্ন বর্ণিত উক্তিটি উল্লেখ করেছেন-

قال موسى بن عقبى كانت في شوال سنة اربع অর্থ: মুসা বিন উক্বা বলেছেন- খন্দক যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। ইমাম বুখারী (রহ.) উক্তিটিকে প্রত্যাখ্যাত বা ভ্রান্ত প্রমাণিত করেননি। যদ্বারা বোঝা যায় এ মতটিই তার নিকট বিশুদ্ধ যে, খন্দকযুদ্ধ ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসের ঘটনা। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উক্ত মতের বিপরীতে আহলে হাদীসদের আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত সীরাতকার সফিউর রহমান মোবারকপুরী লিখেছেন-

وكانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة في شوال على اصح القولين (الرحيق المختوم صــ ٣٠١)

অর্থ: বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী খন্দকযুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো।

(৩৯) ইফকের ঘটনা সম্বলিত হাদীস

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৯৩ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়- باب حديث الافك (ইফকের ঘটনার হাদীস) এবং ৬৯৬ পৃষ্ঠায়

إن الذين جاءوا بالإفك

আয়াতটির তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহ.) একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অধিক দীর্ঘ হওয়ার কারণে হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না। যার ইচ্ছে হয় তিনি বুখারী শরীফের উল্লিখিত পৃষ্ঠায় তা দেখে নিতে পারেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ ঘটনাটি বুখারী শরীফ ব্যতীত প্রায় সকল তাফসীর এবং হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু লা-মাযাহাবীদের অতুলনীয় গবেষক হাকিম ফয়েজ আলম সাহেব বলেন- ঘটনাটি কোন

অবস্থায় হযরত আয়েশার হতে পারে না। যেহেতু ঘটনাটি সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস এবং জীবনীকারগণ নিজেদের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করেছেন, একারণে হাকিম সাহেব তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এবং ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে বিশেষভাবে মনের গহীনে জমে থাকা আবর্জনাসমূহ উগরে দিয়েছেন- সম্মানিত পাঠক তিনি কী লিখেছেন- তা-ই এবার লক্ষ্য করুন। তিনি লিখেছেন- সেই সকল হাদীস বিশারদ, হাদীস ব্যাখ্যাতা, জীবনী লেখক এবং তাফসীরকারদের অনুকরণসর্বস্ব মানসিকতার প্রতি মাতম করতে ইচ্ছে হয়, যারা এতটুকু বিষয়ের তাহকীক ও গবেষণা করতেও অক্ষম ছিলেন যে, ঘটনাটি বস্তুত শুরু থেকেই গলদ ও ভুল। কিন্তু এই ধর্মীয় এবং গবেষণাগত দুঃসাহসিকতার বিলুপ্তি হাজারও সমস্যা ও জটিলতার জন্ম দিয়েছে। আর তা জন্ম নিতেই থাকবে। আমাদের ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন তা বিশুদ্ধ এবং নিঃসন্দেহ। চাই তদ্বারা আল্লাহপাকের খোদায়ীত্ব, নবীগণের নিষ্পাপতা এবং পুণ্যাত্মা নবীপত্নিদের পবিত্রতার নির্মল আকাশে যতই কালিমা লিপ্ত হোক না কেন। এটা কি ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সেই একই ধরনের নিষ্প্রাণ অনুকারবৃত্তি নয়, যেমনটি চার মাজহাবের ইমামগণের অনুসারীরা করে থাকে। (صدیقۂ کائنات ص ۱۰۵) তিনি আরও লিখেছেন- "বস্তুত উক্ত রেওয়ায়েতের প্রশ্নে ইমাম বুখারীকে আমার মতে কোন প্রকার দোষ দেয়া চলে না। কৌশলী কাহিনীকারের নিপুণ অস্ত্রবাজীর সম্মুখে ইমাম বুখারীর হাদীস যাচাই-বাছাই করবার সমুদয় ইলম অকেজো হয়ে পড়ে। (صدیقۂ کائنات ص ۱۰۲) হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) যে মহান রাবীদের সূত্রে ইফকের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- তাদের একজনের ব্যাপারে হাকিম সাহেবের বক্তব্য কী তা-ও শুনে নিন। হাকিম সাহেব লিখেছেন- "ইবনে শিহাব যুহরী জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মুনাফিক ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের শক্তিশালী দালাল ছিলেন। অধিকাংশ বিভ্রান্তিকর নোংরা ও জাল রেওয়ায়েত তার দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়। এমনই একটি রেওয়ায়েত হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক পুত্রের নাম আবদুল উয্যা রাখা হয়েছিল। তার স্রষ্টাও নাকি উক্ত পবিত্রতম(?) সত্ত্বাই ছিলেন- (صدیقۂ کائنات ص ۱۰۷)

(৪০) ইমাম বুখারীর মতে 'রাযাআত' কম হোক বা বেশি তদ্দারা হুরমত ছাবেত হয়ে যায়

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৬৪ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় এমন-

باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمـــن اراد ان يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاع و كثيره

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির দলীলের বর্ণনা যিনি বলেন- শিশুর দুই বছর পরবর্তী দুগ্ধপান দ্বারা হুরমত ছাবেত হবে না। কেননা, আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন- "আর মহিলাগণ পূর্ণ দুই বছর শিশুকে দুধ পান করাবে যে নাকি দুগ্ধদানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়" শিশু দুধ বেশি পান করুক বা কম, তদ্দারা হুরমত প্রমাণিত হবে। উক্ত অধ্যায় দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, ইমাম বুখারীর মতে কোন শিশু কোন মহিলার বেশি দুধ পান করুক বা কম তার দ্বারা হুরমতে রাযাআত সাব্যস্ত হয়ে যায়। শিশুর চার চুমুক বা -পাঁচ চুমুক শর্ত নয়। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন

هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في الاخبار مثـــل حـــديث الباب و غيره وهذا قول مالك و أبي حنيفة

অর্থঃ ইমাম বুখারী রহ. অল্প হোক বা বেশি, রাযাআত দ্বারা হুরমত প্রমাণ করার ক্ষেত্রে অর্থের সেই ব্যাপকতা দ্বারা দলীল দিয়েছেন যা হাদীসসমূহ হতেই বুঝে এসেছে। যেমন উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী কর্তৃক উল্লিখিত হাদীস এবং অন্যান্য আরও হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। আর এটাই ইমাম মালেক এবং ইমাম আবু হানিফার মাজহাব।(فتح الباري جـ٩ـ صـ١٤٦) কিন্তু ইমাম বুখারীর মাজহাব এবং তার উল্লেখকৃত হাদীসের বিপরীতে আহলে হাদীসদের মতানুযায়ী হুরমতে রাযাআত ছাবেত হওয়ার জন্য শিশুর কমপক্ষে পাঁচ চুমুক দুধ পান করা আবশ্যক। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম-এর অভিমত এটাই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইসহাক রাহ্ওয়াই, ইবনে হাযাম এবং আহলে হাদীসদের মাজহাব হুরমত ছাবেত হওয়ার জন্যে কমপক্ষে পাঁচ

চুমুক দেয়া জরুরী। (তাইসিরুল বারী- ৩২/৭) (تيسير البـــاري جـــ٧ صـــ٣٢)

(৪১) ইমাম বুখারীর মতে কুরআন শরীফ খতম করার কোন সময়সীমা নেই

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৫৫ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় "باب في كم يقـــرأ القـــرآن" অর্থাৎ কুরআন কয়দিনে খতম করতে হবে। উক্ত অধ্যায়ের ভাষ্যে আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "ইমাম বুখারী উক্ত অধ্যায় দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন কারীম খতম করার কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা নেই। (তাইসিরুল বারী- ৫৪০/২)

অর্থাৎ ইমাম বুখারীর মতে কুরআন খতমের জন্যে নির্দিষ্টভাবে কোন সময় বেঁধে দেয়া হয়নি। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যত অল্প সময়ে হোক খতম করতে পারে। হযরত ইমাম বুখারী রমজান মাসে প্রতিদিন এক খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) লিখেছেন-

كان محمد ابن اسماعيل البخاري إذا كان اول ليلة من شـــهر رمضـــان يجتمع إليه اصحابه فيصلى بهم و يقرأ في كل ركعة عشرين آية و كذالك إلى ان يختم القرآن و يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من ا لقرأن فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال و كان يختم بالنهار في كل يوم ختمة و يكون ختمه عند الافطار كل ليلة و يقول عند كل ختمة دعوة مستجابة (هدي الســـاري صـــ٤٨١)

অর্থাৎ রমজানের প্রথম রাতে ইমাম বুখারীর নিকট তার শিষ্য ও সাথীবর্গ এসে জমায়েত হতেন। তিনি তাদেরকে তারাবীর নামাজ পড়াতেন। প্রতি রাকাতে বিশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। কুরআন খতম করা পর্যন্ত এই নিয়মেই তারাবী পড়িয়ে যেতেন। শেষরাতে (তাহাজ্জুদে)

কুরআনের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতেন। এমনই করে উক্ত সময়ে প্রতি তিন রাতে কুরআনের এক খতম ওঠাতেন। দিনের বেলা প্রতিদিন এক খতম কুরআন পড়তেন। তিনি এ খতম করতেন ইফতারের সময়। তিনি বলতেন, কুরআন খতমের পর দোআ কবুল হয়। আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহ.)-এর নিকট রমজানের চাঁদরাতে লোকজন একত্রিত হতেন। আর তিনি নামাজ পড়াতেন। প্রতি রাকাতে তিলাওয়াত করতেন বিশ আয়াত। কুরআন খতম হওয়া পর্যন্ত এ নিয়মই চলত। আবার 'সাহর' এ (শেষরাতে) কুরআনের অধিকাংশ বা এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতেন। এভাবে তিন রাতে খতম করতেন। দিনের বেলা এক খতম করতেন। খতমটি হত ইফতারকালে। তিনি বলতেন, প্রত্যেক কুরআন খতমের সময় একটি দোআ কবুল হয়ে থাকে। তাইসিরুল বারী- ১১/১)

কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইমাম বুখারীর মত ও মাজহাব এবং আমলের বিপরীতে বলেন- কুরআন করীম সর্বনিম্ন তিন দিনে খতম করা উচিৎ। এর কমে খতম করা মাকরূহ। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "উত্তম হলো কুরআন বুঝে ধীরে ধীরে চল্লিশ দিনে খতম করা। সাত দিনেও খতম করা যায়। তবে খতমের সর্বনিম্ন মেয়াদকাল তিনদিন। এর চেয়ে কম সময়ে খতম করাকে আমাদের আহলে হাদীসের শায়খ মাকরূহ বলেছেন- উপরন্তু কাজটি আদব ও তা'যীমেরও খেলাফ। তাইসিরুল বারী- ১৩১/২)

তিনি আরও লিখেছেন-আহলে হাদীস মাজহাব মতে তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা মাকরূহ। (তাইসিরুল বারী- ৫৩৫/৬)

(৪২) ইমাম বুখারীর মতে ঋতুবতী মহিলাকে তালাক দিলে তা পতিত হয়

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯০ পৃষ্ঠায় আরেকটি অধ্যায়- باب إذا طلقت الحائض يعتد بــذلك الطــلاق অর্থাৎ ঋতুবতী মহিলাকে দেয়া তালাক, তালাক বলে গণ্য হবে। উক্ত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির শেষাংশে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর যে উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে

তা হলো- حبست علی بتطليقــة অর্থাৎ হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে যে তালাক দিয়েছিলাম তা হিসেবে ধরা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারীর মতে ঋতু অবস্থায় প্রদত্ত তালাক পতিত হয়। আর তা বিধি মোতাবেক এক তালাক বলে গণ্য হবে। মহাত্মা ইমাম চতুষ্টয়ের মাজহাবও এটাই। কিন্তু ইমাম বুখারী এবং চার ইমামের মাজহাবের বিপরীতে লা-মাযহাবীদের কথা হলো- হায়েজ অবস্থায় প্রদত্ত তালাক পতিত হয় না। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "ইমাম চতুষ্টয়, সংখ্যাগুরু ফুক্বাহা তো এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, ঋতু অবস্থায় প্রদত্ত তালাক গণনায় ধরা হবে। পক্ষান্তরে আহলে জাহের, আহলে হাদীস, ইমামিয়া সম্প্রদায়, আমাদের মাশায়েখগণের মধ্য হতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে ক্বাইয়্যিম, ইবনে হাযাম (রহ.) সহ জাফর সাদেক, মুহাম্মাদ বাকের, নাসের প্রমুখ আহলে বাইতের ইমামগণের মতে উক্ত তালাক গণনায় আসবে না। কেননা, এটা 'বিদঈ' এবং হারাম ছিল। আল্লামা শাওকানী এবং আহলে হাদীসের মুহাক্কিক আলেমগণ এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাইসিরুল বারী- ১৪৩/৭)

একটু সামনে গিয়ে লিখেছেন- "এ তালাক পতিত হবে না যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে। (তাইসিরুল বারী-২৩৫/৭)

(৪৩) ইমাম বুখারীর মতে এক বৈঠকে প্রদত্ত তিন তালাক তিন তালাক বলে গণ্য হবে

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯১ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়-

باب من اجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان.

অর্থাৎ কেউ তিন তালাক দিলে তার তিন তালাক পতিত হবে মর্মে যিনি মতপোষণ করেন তার দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী- "তালাক দুই বার। এরপর বিধি অনুসারে হয়ত স্ত্রী রেখে দেবে অথবা উত্তম পন্থায় বিদায় করে দেবে। ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লিখিত যে অধ্যায়টি দাঁড়

করেছেন তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার মতে তিন তালাক তিন তালাক বলেই গণ্য হবে। চাই তা একবারে হোক বা বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথকভাবে দেয়া হোক। কেননা, ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতীত তিন সংখ্যাটিকে শর্তহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। যদি তার মতে এক বৈঠকে এবং একাধিক বৈঠকে তিন তালাক দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত, তাহলে অবশ্যই তিনি পৃথকভাবে আরেকটি অধ্যায় দাঁড় করতেন। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) উক্ত অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

والذي يظهر لي انه كان اراد بالترجمة مطلق وجود الثلاث مفرقـــة كانت او مجموعة (فتح الباري جـــ٩ صـــ٣٦٥)

অর্থ: আমার মনে হয়, ইমাম বুখারী (রহ.) অধ্যায়টির উক্তরূপ শিরোনাম এনে একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিন তালাক দিলে তা পতিত হয়। চাই তা একসাথে দেয়া হোক বা পৃথক পৃথকভাবে। উল্লিখিত অধ্যায়ে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَـــا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّـــهِ –صـــلى الله عليـه وسلم– أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ : لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ »

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। পরে স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, মহিলাটি কি তার প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল সাব্যস্ত হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর ন্যায় তার সাথে সহবাস না করবে। হাদীসটি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এক বৈঠকের তিন তালাক, তিন তালাক বলেই গণ্য হয়। ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের ৭৯২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْـــتَ مَـــرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

অর্থ: ফুক্বাহায়ে কেরাম বলেছেন, কেউ নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যায়। নাফে'র সূত্রে লাইছ বলেছেন- ইবনে উমরকে স্ত্রীকে তিন তালাক দানকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, তুমি একটি বা দুটি তালাক দিলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারতে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। একারণে কেউ যদি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তাহলে স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। এমনকি, অন্যত্র বিয়ে না বসলে সে প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হবে না। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) ফুক্বাহায়ে কেরামের যেই উক্তি এবং হযরত ইবনে উমরের যে বাণী উল্লেখ করেছেন, তদ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, এক বৈঠকের তিন তালাক তিন তালাক হিসেবেই পরিগণিত হবে। কিন্তু ইমাম বুখারী'র মত ও মাজহাব এবং তার উল্লেখ করা হাদীস ও আ-ছারের বিপরীতে আহলে হাদীসদের মতে এক বৈঠকের তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হবে। তারা নিজেদের এ মত ও পথ প্রমাণ করতে একাধিক বই-পুস্তকও রচনা করেছেন। আর তাদের ফাতাওয়া বিষয়ক কিতাবসমূহের সবগুলোতেই মাসআলাটির উল্লেখ রয়েছে।

(৪৪) ইমাম বুখারী'র মতে মুশরিক স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে স্ত্রী প্রথমে মুসলমান হলে, স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ মাত্রই উভয়ের বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া হবে।

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯৬ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়-

باب إذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت الذمي او الحربي

অর্থাৎ কোন মুশরিক বা নাসারা মহিলা স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিধান। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) অধ্যায়টির ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

المراد بالترجمة بيان حكم اسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد اسلامها او يثبت لها الخيار او يوقف في العدة فان اسلم استمر النكاح و إلا وقعت الفرقة بينهماوفيه خلاف مشهور و تفاصيل يطول شرحها و ميــل البخاري إلى ان الفرقة تقع بمجرد الإسلام (فتح الباري جـ۹ صـ٤٢٠)

অর্থ: অধ্যায়টির শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একথা বর্ণনা করা যে, যদি স্ত্রী স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার হুকুম কী? শুধুমাত্র স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের দ্বারাই কি উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে নাকি স্ত্রী ইচ্ছে করলে ইদ্দত পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতে পারবে? স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে উভয়ের বিয়ে বহাল থাকবে নতুবা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। বস্তুত মাসআলাটির মতবিরোধ বেশ প্রসিদ্ধ এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্যন্ত দীর্ঘ।

তবে ইমাম বুখারীর মনের ঝোঁক এই দিকে বলে মনে হয় যে, কেবলমাত্র স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের দ্বারাই উভয়ের বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ থেকে জানা গেল, যদি স্বামী পূর্ব থেকে মুসলমান না হয়ে থাকে, আর স্ত্রী স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই ইমাম বুখারীর মতে উভয়ের বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আহলে হাদীসগণ ইমাম বুখারীর বর্ণিত অভিমতের বিপরীতে এ কথা বলেন যে, স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই উভয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না বরং স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে। সুতরাং আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "অর্থাৎ কেবল স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ মাত্রই বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। যদিও তা এক মুহূর্ত আগে বা পরে হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানিফা এবং আহলে কুফার মাজহাব এটাই। ইমাম বুখারীর অন্তরের টান এদিকে বলেই মনে হয়। কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের অভিমত হলো, স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে বিচ্ছিন্ন হবে না। ইদ্দতের মধ্যেই যদি স্বামী মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকবে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং আমাদের ইমাম

আহমদ বিন হাম্বল এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। আর এটাই সঠিক। (তাইসিরুল বারী- ১৯৯/৭)

(৪৫) ইমাম বুখারীর মতে কুরবানী কেবল ১০ জিলহজ্বে করা উচিৎ

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৩৩ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় এমন- باب من قال الاضحى يوم النحر

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির দলীলের বর্ণনা যিনি বলেন, কুরবানী ১০ জিলহজ্বে করা উচিৎ। ইমাম বুখারী কর্তৃক দাঁড়কৃত এ অধ্যায় হতে বোঝা যায়, তার মতে কুরবানী মাত্র একদিন অর্থাৎ ১০ জিলহজ্বে করতে হবে। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) অধ্যায়টির একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সেগুলোর একটি নিম্নরূপ–

وقيل مراده لا ذبح إلا فيه خاصة يعني كما تقدم نقله عمن قال به (فتح الباري جـ١٠ صـ٨)

অর্থ: কারও মতে ইমাম বুখারী (রহ.) উক্ত অধ্যায় দ্বারা একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, একমাত্র জিলহজ্বের ১০ তারিখেই পশু কুরবানী করতে হবে। যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, কেউ কেউ কেবল ১০ তারীখেই কুরবানী বৈধ হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। (অনুরূপ অভিমত ইমাম বুখারীরও)। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করে তা রদ করেননি। যা হতে এই ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, তার মতে উক্তিটি সঠিক। কিন্তু আহলে হাদীসগণ ইমাম বুখারীর উক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে এক দিনের পরিবর্তে চার দিন কুরবানী করা জায়েয হওয়ার কথা বলে থাকেন। যা তাদেরকে বাস্তবেও করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে তারা অনেক পুস্তিকাও রচনা করেছেন। যা সর্বত্র পাওয়াও যায়।

(৪৬) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী ঈদগাহে করতেন

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৩৩ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়- بــاب الاضحى و المنحر بالمصلى

অর্থাৎ কুরবানী ঈদগাহে করার বর্ণনা। উক্ত শিরোনামের অধীনে ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীস দু'টি উল্লেখ করেছেন–

١. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: হযরত নাফে বলেন- হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) কুরবানগাহে কুরবানী করতেন। হযরত উবাইদুল্লাহ বলেন, উক্ত কুরবানগাহ দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানগাহ'ই উদ্দেশ্য।

٢.عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى

অর্থ: হযরত নাফে থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে উমর (রা.) তাকে বলেছেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে পশু কুরবানী করতেন। উক্ত অধ্যায় এবং হাদীস দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুরবানী ঈদগাহে করা উচিৎ। যা কিনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমরেরও আমল ছিল। কিন্তু আহলে হাদীসগণ ইমাম বুখারী কর্তৃক উল্লেখকৃত শিরোনাম এবং বর্ণনাকৃত হাদীসের বিপরীতে বাড়িতে কুরবানী করে থাকেন। একজন আহলে হাদীসকেও ঈদগাহে কুরবানী করতে দেখা যায় না।

(৪৭) কেবল তিনদিন কুরবানী করা জায়েয এরপরে জায়েয নেই

ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৩৫ পৃষ্ঠায় একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, কেবল তিন দিন কুরবানী করা জায়েয, এরপরে জায়েয নেই। হাদীসগুলো দেখে নিন।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ الأَضْحَى : مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ فِى بَيْتِــهِ مِــنْ أُضْحِيَّتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئٌ وَ بَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْئٌ.

অর্থ: হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বলেন- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- তোমাদের কেউ কুরবানী করলে তৃতীয় রাতের পর যেন এমতাবস্থায় সকাল না করে যে, তার গৃহে কুরবানীর গোস্ত বিদ্যমান থাকে।

٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَــةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- মদীনায় আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে লবণ মাখানো গোস্ত পেশ করতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন- তোমরা এ গোস্ত তিন দিনের অধিক খেও না। হযরত আয়েশার ধারণা উক্ত নিষিদ্ধতা অবশ্য পালনীয় ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল অপরাপর লোকেরাও যেন গোস্ত খেতে পারে।

٣. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ

অর্থ: আবু উবাইদ বলেন- আমি আবারও হযরত আলীর সাথে ঈদের নামায পড়ি। তিনিও প্রথমে নামায পড়ান। এরপরে জনতার উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেন। আর বলেন– নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে তোমাদের কুরবানীর গোস্ত তিন দিনের অধিক ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنْ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– তোমরা কুরবানীর গোস্ত

তিন দিন খাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) মিনা হতে মক্কায় ফিরে যাইতুন তেল দ্বারা আহার করতেন। কুরবানীর গোস্ত হতে পারে আশংকায় গোস্ত খেতেন না। ইমাম বুখারী কর্তৃক রেওয়ায়তকৃত উক্ত হাদীস চারটি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেবল তিন দিন কুরবানী করা জায়েয। এরপরে জায়েয নেই। কেননা, এই হাদীসগুলো হতে বুঝে আসছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত কুরবানীর গোস্ত ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন। এরপরে খেতে নিষেধ করেছেন। একেবারে সহজ কথা, যেহেতু তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোস্ত মজুদ রাখা নিষেধ, সেহেতু তিন দিনের পরে কুরবানী করা জায়েয হবে কী করে? সুতরাং আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী (রহ.) কুরবানী কেবল জিলহজ্জের তিন দিন (১০, ১১, ১২) জায়েয মর্মে দলীল প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন-

ولنا ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث و لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الاضحية (المغني جـ ٨ صـ ٦٣٨)

অর্থ: আমাদের দলীল হলো, নবী কারীম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোস্ত মজুদ রাখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে সময়ে গোস্ত মজুদ রাখা জায়েয নেই, সে সময়ে কুরবানী করাও জায়েয হবে না। কিন্তু আহলে হাদীসগণ বুখারী শরীফের উল্লিখিত চারটি হাদীসকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে অভিমত প্রকাশ করেন যে, উক্ত তিন দিনের পর চতুর্থ দিনেও কুরবানী করা জায়েয। শুধু তা নয়, একে তারা একটি মৃত সুন্নাতের পুনর্জীবন দান বলে বিশ্বাস করেন। এ বিষয়েও তারা বহু পুস্তিকা রচনা করেছেন, যা বাজারে সচরাচর পাওয়াও যায়। স্মর্তব্য, তিন দিনের অধিক গোস্ত মজুদ রাখার নিষিদ্ধতা পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়। তবে কুরবানী তিন দিন পর্যন্ত করা যাবে মর্মে বিধানটি যথারীতি অবশিষ্ট রয়েছে। যা বহু হাদীসে এবং সেগুলোর ব্যাখ্যায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

(৪৮) দাড়ি কী পরিমাণ রাখা সুন্নত?

ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৭৫ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন-

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজকদের) বিরোধিতা কর, দাড়ি দীর্ঘ কর এবং গোঁফ কর্তন কর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হজ্ব বা উমরা শেষে দাড়িগুলো মুষ্টি পাকিয়ে ধরতেন এবং যা তদপেক্ষা দীর্ঘ হত তা কেটে ফেলতেন। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ বর্ণনা করার পরক্ষণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের আমল উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা বোঝা যায়, দাড়ি (কমপক্ষে) একমুষ্টি পরিমাণ দীর্ঘ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দাড়ি (কমপক্ষে) এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা সুন্নত। এরচেয়ে অধিক দীর্ঘ করা সুন্নত নয়। কেননা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) অত্যধিক সুন্নতপ্রেমী সাহাবী ছিলেন। সেই সাথে নবীজির মনের চাহিদাও খুব ভাল বুঝতেন। একারণে যদি এক মুষ্টির অধিক দাড়ি রাখার নির্দেশ দেয়া হত এবং এক মুষ্টির অধিক দাড়ি রাখা সুন্নত হত, তাহলে দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় না রেখে কর্তন করে ফেলা ইবনে উমরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপরন্তু একথাও গভীর চিন্তার দাবী রাখে যে, হাদীসটি ইবনে উমর রেওয়ায়েত করবেন, দাড়ি এক মুষ্টির অধিক দীর্ঘ করার বিধান জানবেন, আবার এক মুষ্টির বাড়তি দাড়ি কেটে নবীজির বিরোধিতাও করবেন এটা কি করে হতে পারে? একথাও বেশ লক্ষণীয় যে, হযরত ইবনে উমর কাজটি হজ্ব ও ওমরার সময়– যে সময় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়ে থাকে- করতেন। কিন্তু অপর কোন সাহাবী তাঁর বিরোধিতা করলেন না বা একথাও বললেন না যে, হে ইবনে উমর তুমি আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের বিরোধীতা করছ?

এ থেকে জানা যায়, সাহাবায়ে কেরাম যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেজাজ-মর্জির প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী ছিলেন, তাদের মতে দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখাই সুন্নত। যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ মোতাবেক আমলও হয়ে যায়। আবার চেহারার রূপ ও সৌন্দর্যও অবশিষ্ট থাকে। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

قلت الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالاعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بافراط طول شعر اللحية أو عرضه فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل ومن طريق أبي هريرة أنه فعله

অর্থ: আমার মতে ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক এক মুষ্টির বাড়তি দাড়ি কর্তনের দ্বারা যা প্রতীয়মান হয়, তা হলো ইবনে উমরের এ আমল হজ্ব ও ওমরার সাথেই বিশিষ্ট ছিল না। বরং তিনি একারণে দাড়ি কর্তন করতেন যে, দৈর্ঘে ও প্রস্থে দাড়ি অধিক লম্বা হয়ে গেলে তা মুখমণ্ডলকে কিম্ভূতকিমাকার বানিয়ে ছাড়বে। ইমাম ত্বাবারী (রহ.) বলেন, একদল হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন দৈর্ঘে ও প্রস্থে দাড়ি কর্তন করা মাকরূহ। আরেক দল বলেছেন দাড়ি এক মুষ্টির অধিক দীর্ঘ হলে বাড়তি অংশ কেটে ফেলা উচিৎ। ইমাম ত্বাবারী নিজ সনদে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে উমর এরূপ করেছেন, হযরত উমর এরূপ করেছেন এবং হযরত আবু হুরায়রাও এরূপ করেছেন- আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.)-এর উক্ত ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, হযরত ইবনে উমর (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উল্লিখিত ফরমান দ্বারা এই উদ্দেশ্য নিতেন যে, দাড়ি এ পরিমাণ দীর্ঘ কর, যাতে চেহারার প্রকৃত আদল বর্তমান থাকে। এতটা সীমা ছাড়িও না যে, চেহারা পাল্টে গিয়ে বিদঘুটে দেখাবে। প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে,

যাদের দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ থাকে, তাদেরকে সুন্দর দেখায়। আর যাদের দাড়ি মাত্রাতিরিক্ত লম্বা তাদেরকে কদাকার দেখায়। আল্লামা ইবনে হাজারের উক্ত আলোচনা দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, কেবল ইবনে উমরই এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখতেন না, বরং তার মহান পিতা হযরত উমর এবং হযরত আবু হুরাইরাও এ পরিমাণ রাখতেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ বুখারী শরীফের এই হাদীসগুলোর বিপরীতে কেউ তো আছেন দাড়ি একেবারে মুণ্ডিয়ে ফেলেন, কেউ রাখেন এক মুষ্টির কম, আবার কেউ এমন বেঢপ ধরনের লম্বা রাখেন যে, তা কৌতুক ও উপহাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু তারা একে সুন্নতও মনে করে এবং এর ওপর পীড়াপীড়ি করে। আহলে হাদীসদের উক্ত কর্মকাণ্ডটি সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় বলে তা প্রমাণের জন্য কোন দলীল উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

(৪৯) ইমাম বুখারীর মতে উভয় হাতে মুসাফাহা করা সুন্নত

হযরত বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের ৯২৬ পৃষ্ঠায় এই অধ্যায়টি দাঁড় করেছেন-باب المصافحة

অর্থঃ মুসাফাহার বর্ণনা। যদ্বারা মুসাফাহা সুন্নত প্রমাণিত হয়। এরপর দাঁড় করেছেন এই অধ্যায়টি- باب الاخذ باليدين و صافح حماد بن زيد المبارك بيديه

আল্লামা ওহীদুজ্জামান শিরোনামটির তরজমা করেছেন এভাবে-উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করা। হাম্মাদ বিন যায়েদ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের সাথে উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করেছেন। (তাইসিরুল বারী-১৭৮/৮)

অধ্যায়টির উক্ত শিরোনাম দ্বারা বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতে উভয় হাতে মুসাফাহা করা সুন্নত। তার কারণ তিনি শুধু باب المصـــافحة উল্লেখ করে ক্ষান্ত হননি। কেননা, কেবল উক্ত অধ্যায় দ্বারা উভয় হাতে মুসাফাহার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না। যদি কেবল প্রথমোক্ত অধ্যায়টি উল্লেখ করতেন তাহলে এক হাতে মুসাফাহা করাকে সুন্নত মনে করার অবকাশ ছিল। এই সম্ভাবনার দুয়ার রুদ্ধ করার জন্যে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) দ্বিতীয়োক্ত অধ্যায়টি দাঁড় করেছেন। আর বলে দিয়েছেন যে, কেউ যেন এক হাতে মুসাফাহা করাকে সুন্নত না ভাবে। সুন্নত হলো, উভয় হাতে মুসাফাহা করা। মহান পূর্বসূরীদের আমলও এটাই ছিল তারা উভয়

হাতে মুসাফাহা করতেন। যেমন হাম্মাদ ইবনে যায়দ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের সাথে উভয় হাতে মুসাফাহা করতেন। পেছনে আপনারা পড়ে এসেছেন যে, হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন- আমার পিতা ইমাম মালেক থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, হাম্মাদ বিন যায়েদের দর্শন লাভ করেছেন এবং আবুদল্লাহ বিন মোবারকের সহিত উভয় হাতে মুসাফাহা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর মাজহাব ও তা প্রমাণ করার স্বপক্ষে বর্ণনাকৃত হাদীস এবং পূর্বসূরীদের আমলের বিপরীতে লা-মাযহাবীগণ এক গুঁয়েমীবশত বলেন- মুসাফাহা কেবল এক হাতে করা সুন্নত। সুতরাং আল্লামা হামিদুল্লাহ মীরাঠী সাহেব এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন- "হামদ-সালাতের পর স্পষ্ট কারে জানা উচিৎ যে, মুসাফাহার ব্যাপারে রেওয়াজ তো এই যে, অধিকাংশ মানুষ তা উভয় হাতে করে এবং এটাকে খুব ভালও মনে করে থাকেন। কিন্তু বহু হাদীস দ্বারা এক হাতে মুসাফাহা করাই প্রমাণিত হয়। (فتاوي نذيريه جـــ٣ صـــ٤١٧)

উক্ত উত্তরেই খানিকটা সামনে গিয়ে তিনি লিখেন 'আরেকটি মাসআলা এও জানা গেল যে, দুই হাতে মুসাফাহা করা সুন্নত নয়। (فتاوي نذيريه جـــ٣ صـــ٤٢٠)

(৫০) নামাযে আরাম বৈঠক সুন্নত নয়

ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৮৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ». فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ». فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ عَلِّمْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ :« إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক কোণে তাশরীফ নিয়ে রেখেছিলেন। সাহাবী নামায শেষে নবীর নিকট এলেন এবং সালাম জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফিরে যাও এবং নামায পড়। কারণ, তুমি নামায পড়নি। সাহাবী ফিরে যান এবং পুনরায় নামায পড়ে এসে নবীকে সালাম জানান। নবীজি আবারও বললেন, ফিরে যাও এবং নামাজ পড়। কারণ, তুমি নামাজ পড়নি। সাহাবী তৃতীয় বারে বললেন, তাহলে আমাকে নামাজ শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে, প্রথমে উত্তমরূপে ওজু করে নেবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে, আর কুরআন শরীফ হতে সহজে যতটুকু পড়তে পারবে পড়বে। এরপর ধীরস্থিরে রুকু করবে। এরপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ধীরস্থিরে সিজদা করবে। এরপর সিজদা হতে উঠে শান্ত হয়ে বসবে। এরপর আবার ধীরস্থিরে সিজদা করবে। এরপর আবার ধীরস্থিরে সিজদা করবে। এরপর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। আর এভাবেই তুমি পুরো নামাজ আদায় করবে।[৭] বুখারী শরীফের এই বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট, মারফু এবং ক্বওলী (অর্থাৎ আদেশজ্ঞাপক) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, নামাযে جلسۂ استراحت অর্থাৎ আরাম বৈঠক সুন্নত নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে নামাজ শিক্ষা দিলেন, রুকু

---

৭. স্মর্তব্য, বুখারী শরীফের আরেক স্থানে শব্দটি جالسا এসেছে। অর্থাৎ শান্ত হয়ে বসবে। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন- শব্দটি সঠিকরূপে সংরক্ষিত হয়নি। তাই قائما (সোজা হয়ে দাঁড়াবে)-এর রেওয়ায়েতটিই সঠিক। দেখুন- (فتح الباري جـــ٢ صـــ٢٧٩)

সিজদা থেকে ওঠার নিয়ম বললেন; কিন্তু আরামে বৈঠক করার উল্লেখ তো দূরের কথা, এদিকে একটু ইঙ্গিতও করলেন না। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নামাযে আরাম বৈঠক সুন্নত নয়। নতুবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে তা শিক্ষা দিতেন। রয়ে গেল সেই রেওয়ায়েতের কথা, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাম বৈঠক করেছেন বলে জানা যায়। রেওয়ায়েতটি ওজরকালীন অবস্থার বলে বিবেচিত হবে। যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর قول و فعل তথা বাণী ও আমলের মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য দেখা না দেয়। দ্বিতীয় আরেকটি কথা হলো, কোথাও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর قول و فعل এর মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে হাদীস বিশারদগণ قول কে প্রাধান্য দান করেন এবং فعل এর কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِث قَالَ لِأَصْحَابِه أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ

অর্থ: হযরত আইয়ূব সাখতিয়ানী হযরত আবু কালাবাহ হতে রিওয়ায়েত করেছেন যে, একদা মালেক বিন হুয়াইরিছ (রা.) তার শিষ্যবর্গকে বললেন, আমি কি বলব যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায কিরূপ ছিল? হযরত আবু কালাবাহ বলেন, তা কোন ফরজ নামাযের ওয়াক্ত ছিল না। সুতরাং ইবনে হুয়াইরিছ দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর রুকু করলেন এবং তাকবীর দিলেন। এরপর রুকু হতে মাথা তুলে কিছুক্ষণ স্থির রইলেন। এরপর সিজদায় গেলেন। এরপর সিজদা হতে মাথা তুলে কিছুক্ষণ স্থির রইলেন। এরপর অপর সিজদা করলেন। এরপর আবার কিছুক্ষণ স্থির রইলেন। মোটকথা, তিনি আমাদের

শায়েখ আমর বিন সালামার ন্যায় নামায পড়লেন। হযরত আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেন, আমর বিন সালামা নামাযে এমন একটি কাজ করতেন যা আমি আর কাউকে করতে দেখিনি। তা এই যে, তিনি তৃতীয় রাকাতের পরে বা চতুর্থ রাকাতের শুরুতে বৈঠক করতেন। উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খায়রুল কুরূন তথা সাহাবা, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনের যুগে আরাম বৈঠককে সুন্নত মনে করা হত না। এ কারণে তার প্রচলনও ছিল না। তার প্রমাণ হলো, হযরত আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহ.) যিনি অত্যন্ত উঁচু মাপের তাবেঈ ছিলেন, সম্মানিত সাহাবা এবং বর্ষীয়ান তাবেয়ীগণের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তিনি হযরত মালেক বিন হুয়াইরিছের সেই হাদীস যাতে তার আরাম বৈঠক করার কথা উল্লেখ আছে বর্ণনা করে বলেছেন হযরত মালেক বিন হুয়াইরিছ (রা.) আমাদের শায়েখ আমর বিন সালামার ন্যায় নামায পড়েছেন। আমর বিন সালামা এমন একটি কাজ করতেন, যা আমি লোকজনকে (অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেঈনকে) করতে দেখিনি। আর তা হলো, আমর বিন সালামা তৃতীয় রাকাতের পর বা চতুর্থ রাকাতের শুরুতে উপবেশন করতেন। সহজ কথায় আরাম বৈঠক করতেন। এ থেকে জানা যায় যে, সে যুগে আরাম বৈঠকের রেওয়াজ মোটেও ছিল না। নতুবা হযরত আইয়ূব সাখতিয়ানী এ কথা বলতেন না যে, আমি সাহাবা ও তাবেয়ীদের এ কাজ করতে দেখিনি। কিন্তু বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসগুলোর বিপরীতে আহলে হাদীসগণ বলেন– আরাম বৈঠক করা মুস্তাহাব বরং সুন্নত। সুতরাং নূরুল হাসান খাঁন সাহেব লিখেছেন- "আর جلسۂ استراحت তথা আরাম বৈঠক করা সুন্নত। (عرف الجادي صـ ٣٠)

নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন–

و يستحب ان يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية (نزل الابرار جـ ١ صـ ٨١)

অর্থ: দ্বিতীয় সিজদার পর ছোট্ট একটি বৈঠক করা সুন্নত। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী লিখেছেন– "এ বৈঠক (আরাম বৈঠক) ওয়াজিব নয়, সুন্নত। (رسول اکرم کی نماز صفحہ ٨٣)

(৫১) মুজতাহিদের 'ক্বিয়াস' শরীয়তের দলীল

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৮৮ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়- من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمها ليفهم السائل

অর্থাৎ একটি জ্ঞাত বিষয়কে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিধানের সাথে অপর একটি সুস্পষ্ট বিষয়কে তুলনা করা, যাতে প্রশ্নকারী প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারে। উক্ত শিরোনামের অধীনে হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীস দু'টি রেওয়ায়েত করেছেন-

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ {أن أعربيا أتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وأبي انْكَرْته . قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ حُمْرٌ، قَالَ فِيهَا أَوْرَقُ؟ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ أَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ؟ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটা কালো পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। যাকে আমি নিজের মনে করি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কি উট আছে? বেদুঈন বলল, হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সেগুলো কী বর্ণের? বেদুঈন বলল, লাল বর্ণের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাতে কি ধুসর বর্ণের উট আছে? বেদুঈন বলল, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এই ধুসর বর্ণের উট এলো কোথেকে? সে বলল, কোন রগ হয়ত তা টেনে এনেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার সন্তানের বর্ণও হয়ত কোন রগ টেনে এনেছে। (অর্থাৎ কোন পূর্বপুরুষের গায়ের রং পেয়েছে) সারকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনকে তার সন্তান অস্বীকার করার সুযোগ দিলেন না।

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ : إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ :« نَعَمْ فَحُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ.

قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ :« اقْضِى اللَّهَ الَّذِى هُوَ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى وَمُسَدَّدٍ عَنْ أَبِى عَوَانَةَ.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন- আমার মা হজ্বের মানত করেছিলেন, এরপর হজ্ব আদায়ের পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করতে পারব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ পারবে। যদি তোমার মা ঋণগ্রস্ত থাকতেন, তাহলে তুমি তা পরিশোধ করতে কি না? মহিলা বললেন, হ্যাঁ পরিশোধ করতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুতরাং আল্লাহর ঋণ পরিশোধ কর। কেননা, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা বেশি জরুরী। উল্লিখিত অধ্যায় এবং হাদীস দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রয়োজন মাফিক কিয়াস করা জায়েয। প্রথম হাদীসটি দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব দেহের রঙের ভিন্নতাকে উটের দেহের রংঙের ভিন্নতার ওপর কিয়াস করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার ঋণ পরিশোধ করাকে মানুষের ঋণের ওপর কিয়াস করেছেন যেহেতু মানুষের ঋণ পরিশোধ করা জরুরী সেহেতু আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা বেশি জরুরী হবে। ইমাম বুখারীর দাঁড় করা উক্ত অধ্যায়ের ব্যখ্যায় আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন- "একেই কিয়াস বলা হয়। অধ্যায়টির উভয় হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, কিয়াস করা জায়েয। কিন্তু সাহাবাদের মধ্য হতে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আর তাবেঈদের মধ্য হতে আমের শা'বী এবং ইবনে সিরীন কিয়াসের বৈধতাকে অস্বীকার করেছেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যান্য সকল ফকীহ এর সর্বসম্মতিক্রমে কিয়াস বৈধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবা ও তাবেঈন কিয়াস করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (রহ.) যে 'রায়' ও কিয়াসের নিন্দা বর্ণনা করেছেন, তা দ্বারা ঐ 'রায়' এবং কিয়াসই উদ্দেশ্য যা হয়ে থাকে ফাসেদ ও ভ্রান্ত। কিন্তু কিয়াস যদি সঠিক শর্তের সাথে হয়, তাও আবার কুরআন-হাদীসে সংশ্লিষ্ট মাসআলার সুস্পষ্ট উল্লেখ

পাওয়া না গেলে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে তা জায়েজ। বস্তুত কিয়াস ব্যতীত কাজ চালিয়ে নেয়াও কঠিন।" (তাইসীরুল বারী-৩৩৯/৯)

কিন্তু ইমাম বুখারীর-এর উক্ত অধ্যায় এবং উল্লিখিত হাদীসের বিপরীতে আহলে হাদীসগণ কিয়াসকে শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন না। তাদের মতে কিয়াস নাজায়েয বরং কিয়াসকে তারা শয়তানী কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তারা বলেন, আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মূলনীতি দু'টি। যথা- اطيعوا الله و اطيعوا الرسول অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তারা রাত-দিন হানাফীদেরকে 'আহলুর রায় ওয়াল কিয়াস' বলে মনের ভেতর জমে থাকা আবর্জনাসমূহ উচ্চারণ করতে থাকেন।

নবাব নূরুল হাসান খান সাহেব লিখেছেন– "আর ইজমারই যখন কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই, তখন প্রচলিত কিয়াস যাকে ফুকাহায়ে কেরাম শরীয়তের চতুর্থ দলীল বলেছেন, তার প্রয়োজনীয়তা আপনা-আপনি পূরণ হয়ে গেছে। দ্বীন ইসলাম এবং খায়রুল আনাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনিত সত্য ধর্মের দলীল প্রমাণ মাত্র দু'টি জিনিসের মধ্যে সীমিত। এক. কিতাবুল্লাহ দুই. সুন্নতে মুতাহহারাহ। এ দু'টি জিনিস ব্যতিরেকে অন্য আর কিছুই উজ্জ্বল প্রমাণ ও অকাট্য দলীলরূপে বিবেচিত নয়। (আরফুল জাদী-পৃ.৩)

নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব স্বপ্রণীত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন- কিয়াস ব্যতীত কাজ চলিয়ে নেয়া দুষ্কর। আবার তিনিই অপর এক গ্রন্থে স্বীয় মত বিশ্বাস প্রকাশ করে লিখেছেন–

واصول الشرع اثنان الكتاب و السنة و زاد بعضهم الاجماع مطلقا و القياس الصحيح أيضا و الحق ان الاجماع الظني و القياس ليستا بحجتين ملزمتين و لكن مظهرتان اقناعيتان (هدية المهدي جـ١ صـ٨٢)

অর্থ: শরীয়তের মৌলিক ভিত্তি দু'টি। এক. আল-কিতাব দুই. আস-সুন্নাহ। কেউ কেউ শর্তহীনভাবে ইজমা এবং বিশুদ্ধ কিয়াসকেও শরীয়তের দলীল বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে ধারণা-লব্ধ ইজমা এবং কিয়াস উভয়টি কোন অকাট্য দলীল নয়। তবে এ দু'টি প্রকাশকারী মাত্র।

(৫২) ইজমা শরীয়তের দলীল

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৮৭ পৃষ্ঠায় একটি নিম্নরূপ অধ্যায় দাঁড় করেছেন-

باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم و حض على اتفاق اهل العلم و ما اجمع عليه الحرمان مكة والمدينة الخ

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেবের তরজমায় অধ্যায়টির মর্ম নিম্নরূপ: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ওলামায়ে কেরামের মতৈক্যের উল্লেখ, তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান এবং মক্কা-মদীনার আলেমগণের ইজমার ইমাম বুখারী কর্তৃক দাঁড়কৃত অধ্যায় দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তার মতে ইজমায়ে উম্মত শরীয়তের দলীল। বিশেষ করে পবিত্র মক্কা-মদীনার আলেমগণের ইজমা। সংখ্যাগুরু ওলামায়ে কেরামের অভিমতও তাই। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উক্ত মতবিশ্বাসের বিপরীতে আহলে হাদীসদের মতে ইজমায়ে উম্মত শরীয়তের দলীল নয়। যেমন পূর্বে এ বিষয়ে উদ্ধৃতি সহকারে আলোকপাত করা হয়েছে। এবার নবাব সিদ্দীক হাসান খান কী বলেন তা-ও লক্ষ্য করুন। তিনি লিখেছেন– "আর বাস্তবিক পক্ষে ইজমা তথা কোন এক বিষয়ে সমস্ত উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাব্যতায়, তা যথার্থরূপে জ্ঞাত হওয়ায় এবং আমাদের নিকট তা অবিকৃতরূপে চলে আসায় মতবিরোধ রয়েছে। এ ব্যাপারে সত্য কথা হলো, এ সবের কোনটিই সম্ভব নয়। এসব বিষয়কে মেনে নেয়া হলেও আবার আমাদেরকে মতানৈক্যের সম্মুখীন হতে হয় যে, ইজমা সত্যি সত্যি শরীয়তের দলীল কিনা? সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের অভিমত তো এই যে, তা শরীয়তের দলীল। আর এর স্বপক্ষে অধিকাংশের দলীল হলো, নিছক বর্ণনাভিত্তিক। তাদের কারও নিকট কোন যৌক্তিক প্রমাণ নেই। সত্য কথা হলো, ইজমা দলীল নয়। পক্ষান্তরে যদি আমরা মেনেও নেই যে, ইজমা দলীল আর এ বিষয়ে অবগতি লাভ করাও সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে বেশি থেকে বেশি এ ক্ষেত্রে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তা সত্য। কিন্তু তাতে এ কথা আবশ্যক হয়ে ওঠে না যে, তা আমাদেরকে মানতেই হবে। (افادة الشيوخ صـ١٢١)

এটাই সেই কারণ, যদ্দরুন আহলে হাদীসগণ ইজমায়ী মাসায়েলের কোন পরওয়া করেন না। বর্তমানকার আহলে হাদীসদের ব্যাপারে এ অভিযোগ কেবল আমাদেরই নয়। তাদের মুরুব্বিদেরও। সুতরাং নবাব ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন– "গাইরে মুকাল্লিদ দল যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে থাকে এমনই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছেন যে, ইজমায়ী মাসায়েলের ব্যাপারে তারা একেবারে লা-পরোয়া। সালফে সালেহীন, সাহাবা ও তাবেঈদের ব্যাপারেও তাদের মনোভাব তথৈবচ। তারা আভিধানিক অর্থ দেখে পবিত্র কুরআনের মন মত তাফসীর করে বসেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত তাফসীরের প্রতিও তারা কর্ণপাত করেন না। অশিক্ষিত কিছু আহলে হাদীসের অবস্থা তো এই যে, তারা রফে ইয়াদাইন এবং সজোরে 'আমিন' বলাকেই আহলে হাদীস হওয়ার মানদণ্ড ঠাওরে নিয়েছে। অন্যান্য আদব, সুন্নত এবং নববী চরিত্রের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। গীবত, মিথ্যা এবং জালিয়াতীর ন্যায় গর্হিত কর্মকাণ্ডকে তারা কিছুই মনে করে না। আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজামাইন। আওলিয়াউল্লাহ এবং সুফিয়ায়ে কেরামের শানে সৌজন্যমূলক ও শিষ্টাচার বর্জিত কথা-বার্তা মুখে এনে থাকে। নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল মুসলমানকে মুশরিক এবং কাফের ভেবে থাকে। কথায় কথায় প্রত্যেককে মুশরিক এবং কবরপূজারী আখ্যা দেয়। (লুগাতুল হাদিস- ৯২/২)

(৫৩) ইজতিহাদ করা জায়েয

বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৯২ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়– باب اجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب او اخطأ। অর্থাৎ বিচারকের ছাওয়াব প্রাপ্তি যখন তিনি ইজতিহাদ করেন। চাই ইজতিহাদ সঠিক হোক বা ভুল। উক্ত অধ্যায়ের অধীনে হযরত ইমাম বুখারী নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

অর্থঃ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, কোন হাকেম বা বিচারক যখন ইজতিহাদ করে ফয়সালা প্রদান করেন আর সে ফয়সালা সঠিক হয়, তাহলে সে দ্বিগুণ ছাওয়াব লাভ করে। আর যখন ইজতিহাদ করে কোন ফায়সালা করে আর সে ফয়সালা ভুল হয় তখন সে পাবে একগুণ ছাওয়াব। ইমাম বুখারী কর্তৃক দাঁড়কৃত উক্ত অধ্যায় এবং তাতে উল্লেখকৃত হাদীসটি হতে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতের মুজতাহিদগণের জন্যে ইজতিহাদ করা জায়েয। অধিকন্তু তাঁর ইজতিহাদ নির্ভুল প্রমাণিত হলে তিনি পাবেন দ্বিগুণ ছাওয়াব। আর তা ভুল প্রমাণিত হলে পাবেন একগুণ ছাওয়াব। এই হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য বহু হাদীসের অধীনে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, এমন বহু মাসআলা ইজতিজাদ করে বের করেছেন। আর উম্মতে মুসলিমা সেগুলোর ওপর আমলও করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী কর্তৃক দাঁড়কৃত অধ্যায় এবং তাতে উল্লিখিত হাদীসের বিপরীতে আহলে হাদীসগণ আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের ইজতিহাদের ঘোরতর বিরোধী। আর নিজেদের মূর্খতার প্রতি নির্ভর করে মহান ইমামগণের ইজতিহাদগুলোকে কিতাব ও সুন্নাহর খেলাফ মনে করেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, লা-মাযহাবীগণ আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের ইজতিহাদ সমূহের তো বিরোধী এবং তা মানতে প্রস্তুত নন। কিন্তু নিজেরাই আবার মুজতাহিদ সেজেছেন। ফলে নিজেরা তা পথভ্রষ্ট হচ্ছেন, অন্যদেরকেও পথহারা করছেন। ضلوا فاضلوا।

এক. বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র এক মুদ (আনুমানিক ১৪ ছটাক) পানি দ্বারা ওজু করতেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করেন না।

দুই. প্রথম খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছা' (সাড়ে তিন সের) পানি দ্বারা গোসল করতেন। কিন্তু এ হাদীস অনাযায়ী আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আমল নেই।

তিন. প্রথম খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীস, হযরত জাবের (রা.) বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাত্র

একটি বস্ত্রে শরীর জড়িয়ে নামায আদায় করতে দেখেছি। কিন্তু আহলে হাদীসগণ উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করেন না। আমি আজ পর্যন্ত কোন আহলে হাদীসকে একটি কাপড় শরীরে জড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখিনি।

চার. প্রথম খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায় রয়েছে–

باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلوة অর্থাৎ ছোট কন্যা শিশুকে নামায অবস্থায় কাঁধে বহন করার বর্ণনা। আমি আজ পর্যন্ত কোন আহলে হাদীসকে এর ওপর আমল করতে দেখিনি।

পাঁচ প্রথম খণ্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন দু'টি খুৎবা প্রদান করতেন। উভয় খুৎবার মাঝে কিছুক্ষণের জন্যে বসতেন। কিন্তু আহলে হাদীসের খতীবগণ মাত্র একটি আরবী খুৎবা প্রদান করেন। উপরন্তু উভয় খুৎবার মাঝে বৈঠকও গ্রহণ করেন না। স্মরণ রাখা দরকার যে, তাদের উর্দূ (বা বাংলা)লেকচারকে কোনক্রমে খুৎবা বলা যাবেনা। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরবী ব্যতীত আর কোন ভাষায় খুৎবা প্রদান প্রমাণিত নেই। সম্মানিত পাঠক! আমাদের পেশকৃত আলোচনা দ্বারা আপনি হয়ত বুঝে উঠতে পেরেছেন যে, আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইমাম বুখারীর প্রতি প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা এবং বুখারী শরীফ অনুযায়ী আমল করার দাবীতে কতটুকু সত্যবাদী? প্রকৃত পক্ষে এরা বুখারী শরীফ অনুযায়ী আমল করার মৌখিক দাবী তো করে থাকে কিন্তু বাস্তবে তারা বুখারী শরীফ অনুযায়ী আমল করেন না। কতিপয় মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার কারণে শুধু বুখারী শরীফ অনুযায়ী আমল করার দাবীতে

ইমাম বুখারীর
দৃষ্টিতে
লা-মাযহাবী
মাওলানা আনোয়ার খুরশিদ দা. বা.
naJmul haider-01911031184